পক্ষীরাজ

ভাদ্র ১৩৮৫
আগস্ট ১৯৭৮

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

—ঃ নিয়মিত পক্ষিরাজ পাবার নিয়ম ঃ—

এক মাসের প্রথম সপ্তাহে কাছের কোন বই-স্টলে খোঁজ করলেই 'পক্ষিরাজ' পাওয়া যাবে। দাম প্রতি সংখ্যা দেড় টাকা। 'পূজা-সংখ্যা' পূজার আগেই বের হবে।

দুই আগাম টাকা দিয়ে গ্রাহক হলে বাড়িতে বসেই ডাকযোগে পক্ষিরাজ পাওয়া যাবে। ডাকে পাঠানোর দায়িত্ব প্রকাশকের। এজন্য গ্রাহককে ডাক মাশুল দিতে হবে না। গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হতে বার মাসের জন্য গ্রাহক হলে ১৬ টাকা এবং ভাদ্র সংখ্যা হতে বার মাসের গ্রাহক হলে ২০ টাকা আগাম পাঠাতে হবে। হাতে বা মানি-অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে পত্রিকার কার্যালয়ের ঠিকানায়। **উভয় ক্ষেত্রেই ১৩৮৫ সালের পূজা সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া হবে।**

তিন প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে 'পক্ষিরাজ' বের হবে। ১০ তারিখের মধ্যে পত্রিকা ডাকে না পেলে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে (ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহ) কার্যালয়ে জানাতে হবে এবং সেই সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট অবশ্যই দিতে হবে। তখন 'ডুপলিকেট কপি' পাঠানো হবে।

চার 'লেখা' পাঠাবার সময় অবশ্যই 'বয়স' উল্লেখ করতে হবে। নইলে নির্বাচনে অসুবিধা হবে।

পাঁচ গ্রাহক না হয়েও লেখা বা প্রশ্ন পাঠাতে বা ধাঁধার উত্তর দিতে বাধা নেই। একাধিক বিভাগের প্রশ্ন একই পত্রে লেখা চলবে না। ধাঁধার উত্তরের জন্যও পৃথক পত্র চাই। মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ধাঁধার উত্তর পত্রিকার কার্যালয়ে আসা চাই।

ছয় বিভাগীয় এবং যথাযথ প্রশ্ন ছাড়া উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ডাকে প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে রিপ্লাই কার্ড অথবা উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।

সাত ইস্কুল, কলেজ, ক্লাব, লাইব্রেরী বুক-স্টল বা যে কোন প্রতিষ্ঠান ২৫ পয়সা ডাক টিকিট সহ লিখলে নমুনা কপির পাঠানো হবে।

আট অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো বা পত্র দিয়ে জানানো সম্ভব নয়। ডাক টিকিট পাঠালে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ফেরৎ পাঠানো যেতে পারে। তবে ফেরৎ পাঠাতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নন।

নয় এজেন্টদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাই।

—ঃ কার্যালয় ঃ—
৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৯
ফোন ঃ ৩৪-৩১৪৬

—ঃ সরবরাহ কেন্দ্র ঃ—
সাকসেস পাবলিশিং হাউস
১ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭৩

পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান
নারায়ণ দেবনাথ
একদিন এক দরিদ্রপল্লী দিয়ে যেতে যেতে শুনলো...
সমুদ্দুরের ধারে বালিতে খেলতে আমার খুব ইচ্ছে করে দাদা!
কিন্তু আমাদের যে পয়সা নেই ভাই। তার চেয়ে আমরা এখানেই খেলা করি।
আমি এখন এই সমস্ত এলাকাটা জাদু করে রাখি— তাহলে ওরা যা ভাববে তাই সত্যি বলে মনে হবে। খেলার আরো প্রেরণা আসবে।
ক্লিং ক্লু ক্লুক আমি যা ভাবাতে চাই ওরা তা ভাবুক!
কিন্তু শুধু বাচ্চাদের ওপরেই নয়-
দু টন বালি। তারা বলেছিলো এখানে দিতে। আরে! ভারি মজার ব্যাপার তো— আর মোটেই কাজের ইচ্ছে নেই! তার বদলে মজা করার, খেলার ইচ্ছে হচ্ছে!
একটা বেলাভূমি! যা এ জায়গাটার এখন দরকার — আর তার ব্যবস্থা আমার সঙ্গে!
ওস্‌স!
দাদা! মনে হচ্ছে আমরা এখন সত্যি সমুদ্দুরের ধারে রয়েছি!
দেখি কারা আগে বালির বড় গুহাঘর বানাতে পারে!
একটু পরে
আশ্চর্য! হেঁকুবাবু—হঠাৎ মনের মধ্যে ছুটির আমেজ অনুভব করছি!
আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম টাকুবাবু! এখানে এখন ক্রিকেট খেললে হয়!
চলে এসো, খোকারা—খেলায় যোগ দাও! এটাকে ছক্কা হাঁকড়াচ্ছি!
ছক্কার বদলে ফক্কা — আউট!

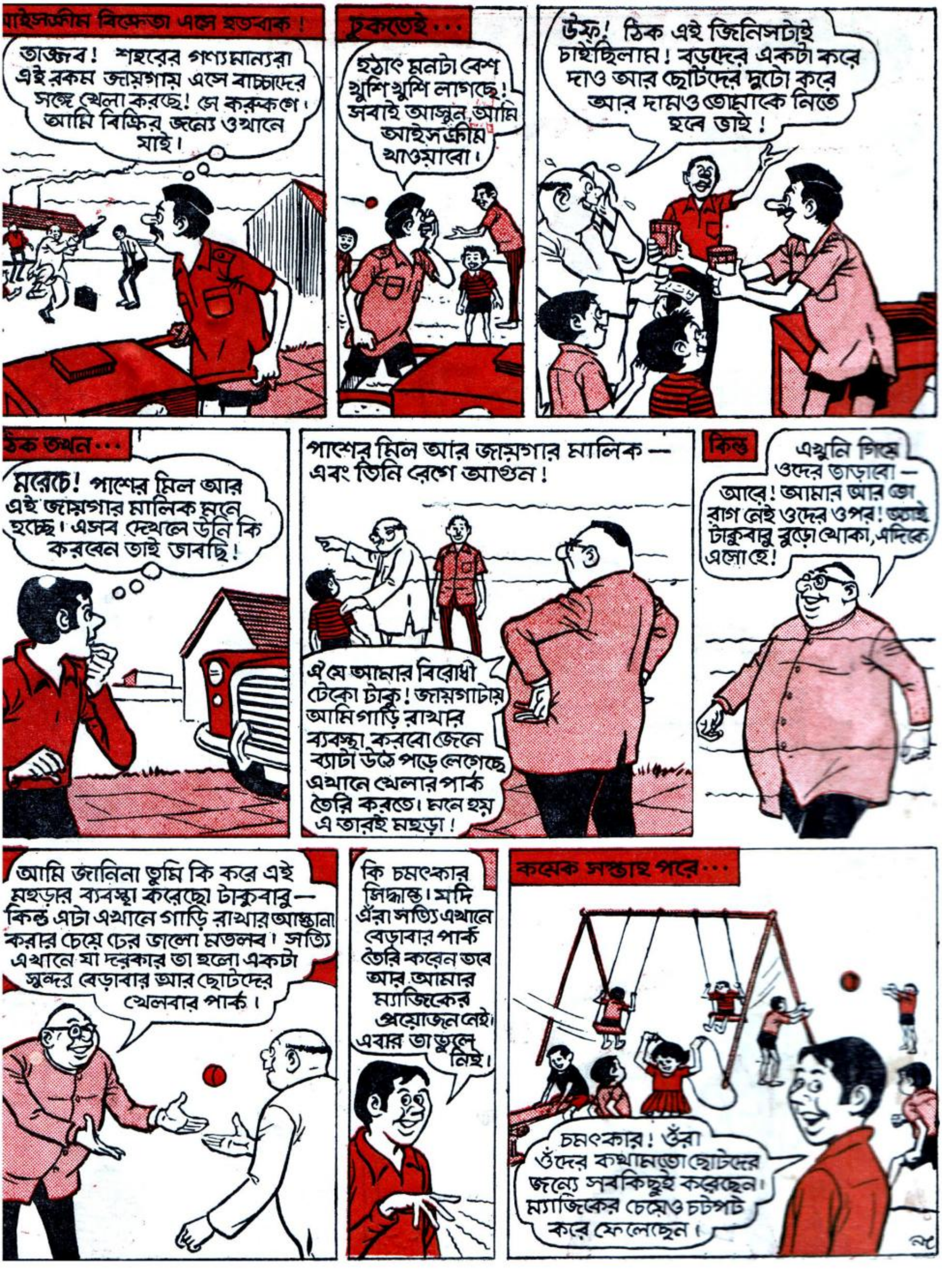
আইসক্রীম বিক্রেতা এসে হতবাক!
তাজ্জব! শহরের গণ্যমান্যরা এই রকম জায়গায় এসে বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করছে! সে করুকগে। আমি বিক্রির জন্যে ওখানে যাই।
ঢুকতেই...
হঠাৎ মনটা বেশ খুশিখুশি লাগছে! সবাই আসুন, আমি আইসক্রীম খাওয়াবো।
উফ্! ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলাম! বড়দের একটা করে দাও আর ছোটদের দুটো করে আর দামও তোমাকে নিতে হবে ভাই!
ঠিক তখন...
মরেছে! পাশের মিল আর এই জায়গার মালিক মনে হচ্ছে। এসব দেখলে উনি কি করবেন তাই ভাবছি!
পাশের মিল আর জায়গার মালিক — এবং তিনি রেগে আগুন!
ঐ যে আমার বিরোধী টেকো টাকু! জায়গাটায় আমি গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করবো জেনে ব্যাটা উঠে পড়ে লেগেছে এখানে খেলার পার্ক তৈরি করতে। মনে হয় এ তারই মহড়া!
কিন্তু
এখুনি গিয়ে ওদের তাড়াবো — আরে! আমার আর তো রাগ নেই ওদের ওপর! আরে টাকুবাবু বুড়ো খোকা, এদিকে এসো হে!
আমি জানিনা তুমি কি করে এই মহড়ার ব্যবস্থা করেছো টাকুবাবু — কিন্তু এটা এখানে গাড়ি রাখার আস্তানা করার চেয়ে ঢের ভালো মতলব। সত্যি এখানে যা দরকার তা হলো একটা সুন্দর বেড়াবার আর ছোটদের খেলবার পার্ক।
কি চমৎকার সিদ্ধান্ত। যদি এঁরা সত্যি এখানে বেড়াবার পার্ক তৈরি করেন তবে আর আমার ম্যাজিকের প্রয়োজন নেই। এবার তা তুলে নিই।
কয়েক সপ্তাহ পরে...
চমৎকার! ওঁরা ওঁদের কথামতো ছোটদের জন্যে সবকিছুই করেছেন। ম্যাজিকের চেয়েও চটপট করে ফেলেছেন।

১ম বর্ষ
৫ম সংখ্যা
১লা ভাদ্র ১৩৮৫

চিত্রে শরৎচন্দ্র অমর কথাশিল্পী/প্রেমেন্দ্র মিত্র । ৮
কার্টুন পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান/নারায়ণ দেবনাথ । ৩
ছড়া ও কবিতা আমার ঘরে আমি রাজা/অন্নদাশঙ্কর রায় । ৬
লোডশেডিংয়ের ছড়া/অমিতাভ চৌধুরী । ৭
ছড়ার ফ্যাচাং/সুবোধ দাশগুপ্ত । ৩৮
ছড়া/সুকুমার ভট্টাচার্য । ১৫
কাশফুল/গোপালী নন্দী । ১১
স্বপ্নেভেজা/সমরেশ মন্ডল । ২০
কার্টুন পিকলু/পরিচয় গুপ্ত । ৩৩
বিশেষ রচনা শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প/গোপালচন্দ্র রায় । ১০
প্রতিদিনের জীবন থেকে/কবিতা সিংহ । ৫২
গল্প সকালবেলা/সন্তোষকুমার ঘোষ । ৫৫
জোড়াসাঁকোর সিংহ/পূর্ণেন্দু পত্রী । ১২
উড়ে গেলাম ওপিঠে/শৈল চক্রবর্তী । ১৬
মানুষ খেকোর সন্ধানে/বরেন গঙ্গোপাধ্যায় । ২১
বিশু ডাকাতের রণ-পা/অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় । ২৯
একা রাজু/ভাস্বতী রায়চৌধুরী । ৩৬
বাদশার কুকুর/রাধানাথ মন্ডল । ৩৪
ভ্রমণ কাহিনী চলো আমার সঙ্গে/শক্তি চট্টোপাধ্যায় । ২৬
বিজ্ঞান-বিষয়ক বিজ্ঞান নিয়ে প্রশ্নের উত্তর/সমরজিৎ কর । ৬০
জানার মত নানা কথা/অরুপরতন ভট্টাচার্য । ৫৯
খেলা এ স্মৃতি সুখের, এ স্মৃতি আনন্দের/পি.কে. ব্যানার্জী । ৪৫
খেলা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর/পি. কে. ব্যানার্জী । ৪৬
পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে/অজয় বসু । ৪৮
স্পোর্টস এবং স্পোর্টসম্যান/মুকুল দত্ত । ৫০
ম্যাজিক ম্যাজিক নিয়ে প্রশ্নের উত্তর/জাদুকর পি. সি. সরকার । ৫৮
পড়ুয়াদের পড়ার আসর মুক্তশিক্ষা/সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় । ৪২
এস, আমরা ইংরিজি শিখি/লীলা মজুমদার । ৪৪
এস, আমরা বাংলা শিখি/বিজয়া মুখোপাধ্যায় । ৪১
ধাঁধা ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর । ৬২
প্রশ্নের উত্তর পত্রপাঠ । ৩৯
প্রতিযোগিতা ভেবে ভেবে সমাধান/শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় । ৫১
ছবি দেখে গল্প লেখো/পূর্ণেন্দু পত্রী । ২৮
প্রতিযোগিতার ফলাফল (আষাঢ়) ২৮

উপদেষ্টা পরিষদ

সন্তোষকুমার ঘোষ
অমিতাভ চৌধুরী
অজয় বসু
মহাশ্বেতা দেবী
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সমরজিৎ কর
পূর্ণেন্দু পত্রী
নবনীতা দেব সেন

সম্পাদক
মনোজ দত্ত

সহ-সম্পাদক
অনিলকুমার করাতি

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী
অলংকরণ সুবোধ দাশগুপ্ত প্রভাত কর্মকার

প্রাপ্তিস্থান—সাকসেস পাবলিশিং হাউস ১ বিধান সরণী কলিকাতা ৭৩

আমার ঘরে আমি রাজা

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমার ঘরে আমি রাজা
তোদের তাতে কী ?
খাচ্ছি কোন তিলে খাজা
তোদের তাতে কী ?
ফুলুরি আর বাদাম ভাজা
তোদের তাতে কী ?

চৌকি আমার সিংহাসন
তোদের তাতে কী ?
হাবলু গাবলু সভাজন
তোদের তাতে কী ?
পুষি বাঘা প্রজাগণ
তোদের তাতে কী ?

দিগ্বিজয়ে যাবেন রাজা
তোদের তাতে কী ?
দুশমনদের দেবেন সাজা
তোদের তাতে কী ?
বাজা, বাজা, বাদ্যি বাজা
জয় মহারাজকী !

ছবি ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী

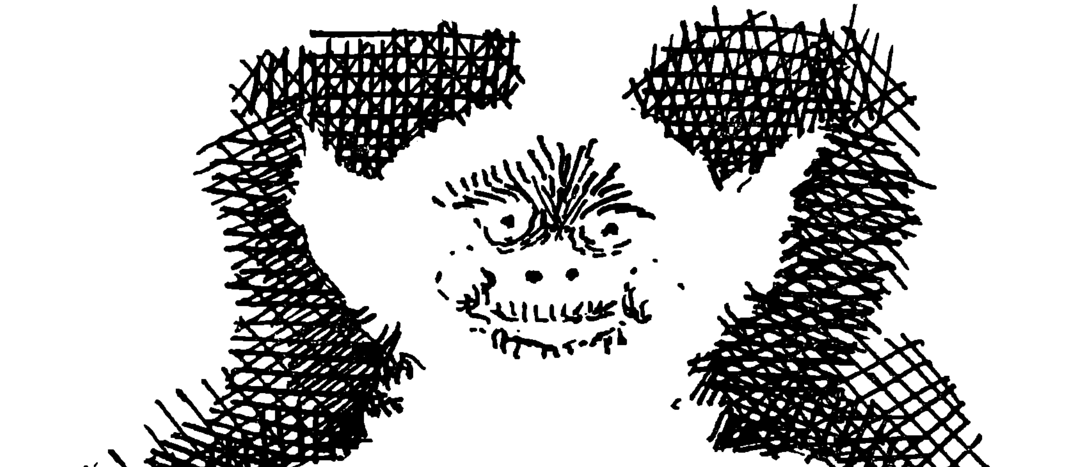

লোডশেডিংয়ের ছড়া

অমিতাভ চৌধুরী

ঠিক দুক্কুর বেলা
ভূতে মারল ঢেলা
ভূত নয়ত, যমের দূত
অন্ধকারের ডেলা।
আলোর গলা ধরল টিপে
করল নিখুঁত খুন,
পূর্নিমেতে অমাবস্যা
ডার্কনেস অ্যাট নুন।
ফ্যান চলে না, ফ্রিজ চলে না
ভয়ে পাথর সব
ভূতের থাবা চড়ের বাবা
ঘামেতে জবজব।
কাজকম্ম ফেলে বিবি
বাপের বাড়ি গেলা
সাহেব বসে রাঁধেন বাড়েন
কাঁদেন এক্কেলা।
ঠিক দক্কুর বেলা।

ছবি : সুবোধ দাসগুপ্ত

হুগলী জেলা
দেবানন্দপুরের উৎপাত একটি ছেলে। ডাক নাম ন্যাড়া। 'ন্যাড়া' বলতে সবাই বোঝে গাঁয়ের বাগানে বাগানে ফল মূল চুরি-করে ফেরা গাছে গাছে চড়ে-বেড়ালো।
দুষ্টুমি বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় একটি ছেলে
ন্যাড়া!
সেই ছেলেই ভবিষ্যতের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্ম ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬
পড়াশুনার জন্যে পাঠান হল ভাগলপুরে মামার বাড়িতে সেখানেও যোগ্য সঙ্গী ভাবী সাহিত্যের 'ইন্দ্রনাথের' সঙ্গে দুঃসাহসিক সব দুরন্তপনা করে বেড়ালেও
১৮৯৪-এ প্রবেশিকা পাস করেন। ফী জমা দেবার টাকার অভাবে তার পরের এফ এ পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না। সেই বয়সেই চলে যান ভারত ভ্রমণে।
ফিরে আসার পর বেশীর ভাগই বেকার বাউন্ডুলে জীবন। তারই মধ্যে সতেরো বছর বয়সে সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছেন কিন্তু তাতে জীবিকার সংস্থান হয়না। তাই একদিন ভাগ্য পরীক্ষা করতে বর্মায় পাড়ি দিলেন ১৯০৩ সালে।
তার আগেই তাঁর ছদ্মনামে লেখা একটি গল্প 'কুন্তলীন' পুরস্কার পেয়েছে ১৯০২ সালে। বর্মায় তাঁর খ্যাতি ছিল কিন্তু অভিনয় আর ছবি আঁকার জন্যে
কে এ শরৎচন্দ্র?
তারপর ১৯১২ সালে ফণীন্দ্র পাল সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত কটি রচনা সাহিত্য জগৎ আলোড়িত করে তুলল।
এ কার লেখা?

তার আগেই ১৯০৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'বড়দিদি' উপন্যাসটি অসীম কৌতূহল ও বিস্ময় জাগিয়েছে পাঠকমহলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ছদ্মনামে লিখছেন মনে করেছে অনেকে। 'যমুনা'র পর 'ভারতবর্ষে' 'বিরাজ বৌ' 'পল্লীসমাজ' প্রভৃতি প্রকাশের সঙ্গে তিনি জীবনকালেই সাহিত্যের এক কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন।
বর্মার স্বেচ্ছা নির্বাসন ছেড়ে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন ১৯১৬ সালে। তাঁর তখনকার চেহারা আজকের পাঠকের অনেকেরই অচেনা
এর পর বেশ কিছুদিন রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড়'এ বাসা বেঁধে থাকেন।
জনপ্রিয়তায় তিনি তখন সকলের ওপরে। তাঁর প্রত্যেকটি বই নিয়ে পাঠকমহলে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।
চরিত্রহীন
দেবদাস
শ্রীকান্ত
গৃহদাহ
সমস্ত দেশ তাঁকে সমাদরে মাথায় তুলে রাখবার জন্যে ব্যাকুল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জয়মাল্য দেন – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় জগত্তারিণী পদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সগৌরবে
ডিলিট বা সাহিত্যাচার্য উপাধি দেয়।
কিন্তু এসব সম্মান সমাদরে তাঁর ভেতরের আগুন নেভেনা। দেশের বিপ্লবীদের সমর্থনে অকুতোভয়ে তিনি লেখেন . .
বিদেশী সরকার বাজেয়াপ্ত করেন সে বই!
পথের দাবী
সমস্ত দেশের অসীম শ্রদ্ধা ভালবাসা নিয়ে এই অসামান্য সাহিত্য স্রষ্টা ১৯৩৮এ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সময়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে স্তিমিত হবার বদলে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির আকর্ষণ আরো তীব্র হয়ে উঠেছে সমস্ত দেশবাসীর কাছে।
পাঞ্জাবী
রাজস্থানী
নেপালী
অসমীয়া
গুজরাটি
মারাঠী
হিন্দী
বাংলা
ওড়িয়া
শুধু বাংলাভাষী নয় সমস্ত ভারতবাসীর আজ তিনি একান্ত আপনার সব চেয়ে প্রিয় লেখক।
পরিকল্পনা • প্রেমেন্দ্র মিত্র
চিত্র • ধ্রুব রায়

শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প

গোপালচন্দ্র রায়

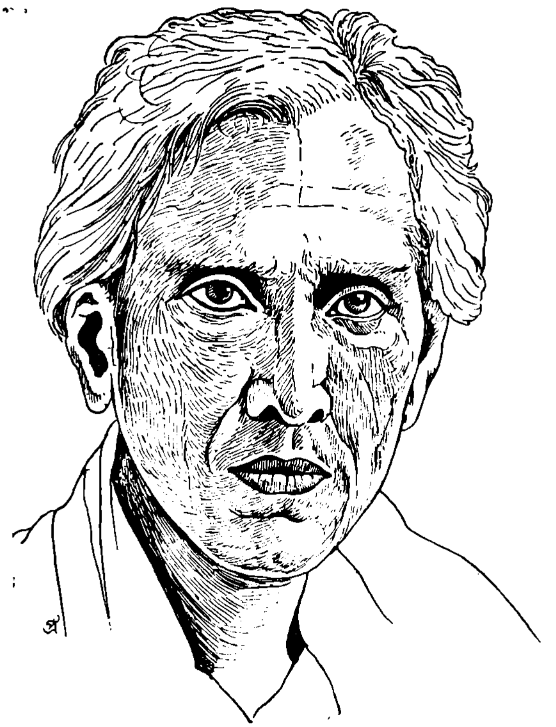

বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আজও সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প উপন্যাস লেখক হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর লেখা পড়ে দেশবাসী তাঁকে আখ্যা দেন—অপরাজেয় কথাশিল্পী। তাঁর সেই আখ্যা আজও সমানেই অম্লান রয়েছে।

শরৎচন্দ্র গল্প উপন্যাস প্রভৃতি নিয়ে বই লিখেছেন খুব বেশী নয়। সংখ্যায় মাত্র ৩৮টি। গোটা তিনেক উপন্যাস কিছুটা করে লিখে শেষ করে যেতে পারেননি। এগুলো ছাড়া আর আছে তাঁর কয়েকটা টুকরো রচনা।

শরৎচন্দ্র কিভাবে প্রথম এই সাহিত্য রচনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং প্রথম কি অবস্থায় কি গল্প লিখেছিলেন, এখন সে সম্বন্ধেই দু একটা কথা বলছি—

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় সেকালের এনট্রান্স পাশ ছিলেন। কিছু দিন কলেজেও পড়েছিলেন। সেকালে সরকারী বা ভালো চাকরী পাওয়া অনেকটা সহজ লভ্য হলেও মতিলাল অতি অল্প কয়েক দিন ছাড়া জীবনে আর চাকরি করেন নি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে অবসর সময়ে তিনি ঘরে বসে প্রধানতঃ বই পড়ে ও গল্প উপন্যাস লিখে কাটাতেন। তবে তিনি দরিদ্র এবং অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে লেখা গল্প উপন্যাসের কোনোটাই শেষ করেন নি। খানিকটা করে লিখে ফেলে রাখতেন।

শরৎচন্দ্র যখন স্কুলের ছাত্র, তখন লুকিয়ে বাবার ঐ লেখাগুলি নিয়ে পড়তেন! আর পড়ে পড়ে ভাবতেন গল্পের শেষটা বা পরের অংশটা কি হতে পারত বা হওয়া উচিত ছিল। এইভাবে অতি অল্প বয়সেই স্কুলের ছাত্র অবস্থায় আপনা হতেই গল্প রচনার দিকে শরৎচন্দ্রের একটা আগ্রহ আসে।

শরৎচন্দ্র প্রথম যে গল্পটি লেখেন তার নাম 'কাশীনাথ'। তখন তাঁর বয়স সতের। শরৎচন্দ্র ঐ সময় হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের দশম শ্রেণীতে উঠেও অভাবের জন্য পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসেছিলেন। পিতার দারিদ্র্যহেতু তাঁকে একবছর পড়া বন্ধ রাখতে হয়েছিল। পরে দেবানন্দপুরের গ্রামের বাড়ি থেকে ভাগলপুরে মামার বাড়িতে যান এবং সেখান থেকেই এনট্রান্স পাশ করেন।

শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে বসে কাশীনাথ গল্পটি লিখলেও পরে আবার ভাগলপুরে গিয়ে এটিকে সংশোধন করে পরিবর্ধিত করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র বলতেন—আমার গল্প উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই অর্থাৎ যাদের কথা বলেছি, তারা প্রায় সকলেই আমার দেখা। আমি দেখা জিনিষ ছাড়া বড় একটা লিখিনি।

এখন শরৎচন্দ্রের নিজের এই কথা অনুযায়ীই তাঁর প্রথম গল্প কাশীনাথে তাঁর দেখা ও জানা কাহিনী কতটা আছে দেখা যাক—

শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় গ্রামের যে পাঠশালায় পড়তেন সেই পাঠশালার গুরু মশায় ছিলেন প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্যারীবাবু ছিলেন শরৎচন্দ্রের প্রতিবেশী। তিনি আগে হাওড়া জেলায় বালীতে একটা হাই স্কুলে পণ্ডিতী করতেন। স্কুল থেকে অবসর নিয়ে নিজের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে একটা পাঠশালা খুলেছিলেন। এইজন্য লোকে তাঁর পাঠশালাকে প্যারীপণ্ডিতের পাঠশালা বলতো।

এই পাঠশালায় প্যারীবাবুর একমাত্র পুত্র কাশীনাথও পড়ত। কাশীনাথ শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে দু এক বছরের বড় হলেও উভয়ের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। খেলা-ধুলোয় এবং বাড়ির পাশের সরস্বতী নদীতে ডোঙা ও নৌকা বাওয়ায় কাশীনাথ ও শরৎচন্দ্রকে এক সঙ্গে দেখা যেত।

কাশীনাথ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ

করার কয়েক বছর আগেই তার বাবা মারা যান। তখন কাশীনাথ কাকা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে থাকে। রাখালবাবুর কন্যা ছিল, কিন্তু পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তিনি একমাত্র বংশধর কাশীনাথকে অত্যন্ত আদর-যত্নেই পুত্রবৎ লালন-পালন করেছিলেন।

কাশীনাথ তার বাবার কাছে সংস্কৃত তো পড়েছিলই, তাছাড়া টোলেও পড়েছিল। এই কাশীনাথ এনট্রান্স পাশ করার পর কাকার অমতে নিজে বিয়ে করে যখন দেবানন্দপুর গ্রাম ছেড়ে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে ঘর-জামাই হ'ল—তখন কাশীনাথের কাকা রাখালবাবু যেমন মনে আঘাত পেয়েছিলেন, তেমনি কাশীনাথের দেবানন্দপুরের বন্ধুরা বিশেষ করে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শরৎচন্দ্রও বন্ধু-বিরহে বেশ কষ্ট অনুভব করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এই সময়েই দেবানন্দপুরে বসে গ্রামের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে যুক্তি করে কাশীনাথ নাম দিয়েই এবং তার জীবনের অধিকাংশ কাহিনী নিয়েই কাশীনাথ গল্পটি লিখেছিলেন। তাই গল্পের কাশীনাথে এবং বাস্তব কাশীনাথে, উভয়ের মধ্যে বেশ মিল দেখা যায়। যেমন—উভয় কাশীনাথেরই উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়, উভয় কাশীনাথেরই পিতা সংস্কৃত-পন্ডিত ছিলেন এবং উভয় কাশীনাথই সংস্কৃত অধ্যয়ন করত। উভয় কাশীনাথই ধনী শ্বশুরের একমাত্র করে জামাতা এবং গৃহজামাতাও।

গল্পের কাশীনাথ পিতৃ বিয়োগের পর মামার বাড়িতে মানুষ হয়। আর বাস্তব কাশীনাথ পিতার মৃত্যুর পর কাকার কাছে মানুষ হয়েছিল। গল্পের খাতিরে শরৎচন্দ্র বাস্তব কাকাকে গল্পে মামা করেছেন।

গল্পে এবং বাস্তবে উভয় ক্ষেত্রেই বিবাহের কিছুদিন পরেই উভয় কাশীনাথেরই মৃত্যু হয়।

গল্পে নদীর ধার, চন্ডীমন্ডপ, জমিদারবাবুদের শিবমন্দির আছে। বাস্তব কাশীনাথের দেবানন্দপুর গ্রামেও সরস্বতী নদী, নিজেদের চন্ডীমন্ডপ এবং গ্রামের জমিদার দত্ত মুন্সিদের বিখ্যাত শিব মন্দির সবই আছে।

গল্পের কাশীনাথ এবং বাস্তবের কাশীনাথে এইভাবে বহু মিল থাকলেও, তবু একথা স্বীকার্য যে, সকল সাহিত্যিকের মতই শরৎচন্দ্রও তাঁর কাশীনাথ গল্পকে রসোত্তীর্ণ করবার জন্য বাস্তব কাহিনীর উপর কিছু কিছু কল্পনার তুলিও বুলিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর এই 'কাশীনাথ' গল্পের সঙ্গে তাঁর আরও ছটি ছোট গল্প একত্র করে 'কাশীনাথ' নামের গল্পগ্রন্থটি করেন। সে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় আজ থেকে ৬২ বছর আগে ১৩২৪ সালের ভাদ্রমাসে।

কাশফুল

গোপালী নন্দী

কাশফুল তুলতুল
চেয়ে আছে আকাশে
সাদা মেঘ পাখনায়
ভেসে যাবে বাতাসে।
ঝিলমিল শরতের
সাদা তুলো ফুলটা
মনেখুশী এনে দেয়
ভেঙে দেয় ভুলটা।
মাথা তুলে দলে দলে
মাঠে মাঠে দুলছে
হেসে দুলে ফুল কলি
খোকা খুকু তুলছে॥

সংযুক্তা মিত্রের

মধুরাংশ্চ ৬·০০

ভূমিকায় লেখিকা লিখেছেন ঃ

দেশ, আনন্দবাজার, মাসিক বসুমতী, উদ্বোধন প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নানা জাতীয় প্রবন্ধ একত্র সংকলিত করে রসবোদ্ধা পাঠক সমাজকে সবিনয়ে নিবেদন করছি। বিষয় নানা মুখী হলেও সকলের মধ্য দিয়ে একটি সুরই ধরতে চেষ্টা করেছি, সেটি হল এই 'অরূপ বীণা, রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে।' পেরেছি কিনা সে বিচারের ভার আমার নয়।

জনপ্রিয় প্রকাশনী ঃ ৩৮বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯
পরিবেশক ঃ **দে বুক ষ্টোর্স**

জোড়াসাঁকোর সিংহ

পূর্ণেন্দু পত্রী

এবারে এক সিংহের গল্প।

হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক একদিন দুটি ছাত্রকে কী যেন বোঝাচ্ছেন। দুটি ছাত্রই মনোযোগ দিয়ে শুনছে। এমন সময় একজন ছাত্র পিছন থেকে পাশের ছাত্রটির মাথায় সজোরে মারলে এক চাঁটি। ছেলেটি উঠল চমকে। ধমকে উঠলেন শিক্ষক মশায়।

—একি ! তুমি ওকে অকারণে চাঁটি মারলে কেন ?

ছাত্রটির সবিনয় উত্তর

—স্যার, আমি জাতিতে সিংহ। তাই নিজের স্বভাবটা ছাড়তে পারিনি।

চাঁটি খেয়ে সহপাঠী ছাত্রটি সম্ভবত কেঁদেছিল। চাঁটির স্বপক্ষে এমন অকপট স্বীকারোক্তি শুনে শিক্ষক মশায় সম্ভবত হেসেছিলেন।

চাঁটি-মারা ছাত্রটি কিন্তু মিথ্যে কথা বলেনি। সে সিংহ পরিবারেরই ছেলে। বাবা নন্দলাল সিংহ। ডাক নাম সাতু বাবু। পেশায় দেওয়ান। অগাধ তাঁর বিষয়-সম্পত্তি। সুখের জীবন। সোনার সংসার। জোড়াসাঁকোয় বিরাট অট্টালিকা। সম্ভ্রান্ত বংশ।

শান্তিরাম সিংহ বংশের আদি পুরুষ। ছিলেন মুর্শিদাবাদ আর পাটনার দেওয়ান। ছিল এমাথা-ওমাথা ছড়ানো বিরাট জমিদারী উড়িষ্যায়। কলকাতার হিন্দু সমাজে যেমন নাম-ডাক, তেমনি মান-সম্মান। শান্তিরামের দুই ছেলে। প্রাণকৃষ্ণ আর জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণর ছেলে নন্দলাল।

আমরা যে সিংহের গল্প শুনতে বসেছি, তিনি এই নন্দলালেরই ছেলে। নাম কালীপ্রসন্ন। কিছুদিন হিন্দু কলেজের পড়ুয়া। পড়তে পড়তে যেই পা পড়ল তেরোয়, অমনি ডাক পড়ল বিয়ের পিঁড়িতে। বিয়ে হয়ে গেল মহা ধুমধামে। বাগবাজারের কনে। লোকনাথবাবুর মেয়ে। ছেলের যখন বিয়ে, বাবা তখন পরলোকে। নন্দলালের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হরচন্দ্র ঘোষ। ছোট আদালতের একজন বিচারক। তিনিই এখন বন্ধুর সংসারের অভিভাবক। কোনো খুৎ রাখলেন না বন্ধুর ছেলের বিয়েতে। নাচের আসর জমল বেশ কয়েকদিন ধরে। সাহেব-মেমসাহেবদের জন্যে নাচ-গান, খানা-পিনার মজলিস। দেশীয় বাবুদের জন্যে তুমুল ভোজ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্যে দান-ধ্যান।

বিয়ের পর বছর-তিনেক মাত্র স্কুলে আসা-যাওয়া। তার পরই হিন্দু কলেজের সঙ্গে ছাড়া ছাড়ি। ছাত্র হিসেবে মোটেই ভাল নয়। কিন্তু লেখা-পড়ায় আগ্রহী। তাই এখন থেকে বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখেই যা কিছু শেখা। মিস্টার কার্ক পেট্রিক শেখান ইংরেজী। এ ছাড়াও আছে বাংলা আর সংস্কৃতের শিক্ষক। তখন ইংরেজীরই দাপ-দাপটা। ইংরেজী পোষাক, ইংরেজী চাল-চলন, ইংরেজী বুলিরই দাম বেশী। কালীপ্রসন্ন ইংরেজী শেখেন। কিন্তু তাঁর আসল টানটা মায়ের মুখের ভাষার দিকে। ঘুমোবার আগে, ঘুম পাড়ানোর জন্যেই ঠাকুমা শোনাতেন নানান রকম রূপকথা-উপকথা। মুখে মুখে আউড়ে যেতেন কবিকঙ্কন, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের পয়ার। কালীপ্রসন্নর কান বড় সজাগ। একবার শুনলেই মুখস্থ। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের কাছে সেই সব শুনিয়ে জুটতো বাহোবা। ঘরে এসে মাকে শোনালে জুটতো সন্দেশ। বেশী সন্দেশ খেলে তোৎলা হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে ছাদে উঠে কাকদের পায়রাদের ডেকে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ানো চলত। কাক-পায়রারাও সবটা খেতে না পারলে তখন ডাক পড়তো মুঞ্জুরীর। মুঞ্জুরী হল সিংহি বাড়ির পোষা বেড়াল। দুধের মত গায়ের রঙ। ক্ষীরের মত মিষ্টি স্বভাব। কালীপ্রসন্নর বড় প্রিয় ছিল মুঞ্জুরী।

কালীপ্রসন্নর যখন ষোলোয় পা, তখন স্ত্রী গেছেন মারা। ফলে আবার পরতে হল বিয়ের সাজ। আবার বরাসন, ছাঁদনতলায় শুভদৃষ্টি আর বাসর ঘর। এবারের কনে রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের দৌহিত্রী, চন্দ্রনাথ বসুর একমাত্র মেয়ে। যে পরিবারে, যে রকম পরিবেশে জন্ম তাতে কালীপ্রসন্নর সাজ-পোষাক, স্বভাব চরিত্র অন্য রকম হওয়ার কথা। দিনরাত ঘিরে থাকবে মোসাহেবের ঝাঁক। তারা থেকে থেকে স্তোত্র পাঠের মত গুনগান গেয়ে যাবে। আর একদিকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের জটলা। তাঁরা থেকে থেকে উচ্চারণ করে, ক্ষণজন্মা, যোগভ্রষ্ট, আরও নানান রকম মুখরোচক স্তুতি। পরণে থাকবে লখনৌ ফ্যাসানের চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপাট্টা, পায়ে নাগরা, মাথায় বাঁকা টুপি। অথবা সেপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি, কোমরে রঙিন রুমাল, মাথায় এ্যালবার্ট তেড়ী, কাঁধে শাল, দশ আঙুলে হীরে-মুক্তোর দশটা আংটি। সামনে সোনার আলবোলা। ডানদিকে পান্না বসানো ফরসি। বাঁয়ে হীরে বসানো টোপদার গুড়গুড়ি। পিছনে মুক্তো বসানো পেঁচুয়া। মাথায় ঝাড় লণ্ঠন, টানা পাখা। পায়ের নীচে জরির মছলন্দ। এদিকে আতর দান। ওদিকে গোলাপপাশ। এদিকে তামাক। ওদিকে গাঁজা। সকালে

সং। রাত্রে হাফ আগড়াই। যখন একা, হাতে এসরাজ। যখন ইয়ার-বক্‌সিতে ঘেরাও, তখন রূপোর গেলাসে লাল জল।

এই ভাবে তখনকার আর দশটা বড় মানুষের ঘরের ছেলের মতই কালীপ্রসন্নর উচ্ছন্নে যাওয়ার কথা। কিন্তু কালীপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। তিনি চাইলেন বড় ঘরের ছেলে নয়, বড় দরের মানুষ হতে। নিজেকে গড়তে চাইলেন তখনকার সমাজের সেরা মানুষদের আদলে। বেছে নিলেন বাঙালী পোষাক, বিদ্যাসাগরের আদর্শে। বেছে নিলেন সমাজের মঙ্গলের ব্রত, রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে। বেছে নিলেন বাঙলা ভাষার প্রতি কর্তব্য, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্তের আদর্শে। বেছে নিলেন ধর্মের গোঁড়ামীহীনতা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদর্শে।

হতো সাধারণত ইংরেজীতে। কালীপ্রসন্ন সে নিয়ম ভাঙলেন। তিনি পড়লেন বাংলা প্রবন্ধ।

মারা গেছেন ডেভিড হেয়ার। তাঁর জন্যে স্মৃতিসভা করতে হবে। সকলের আগে কে উদ্যোগী? কালীপ্রসন্ন। বললেন, সভা করার জায়গা নেই? আমার বাড়ীতে হোক।

কলকাতায় তখন নাটকের চেহারাটা ভিখারীর মত। জেল্লা নেই, জৌলুষ নেই, শ্রী নেই, স্বাস্থ্য নেই। কালীপ্রসন্ন আর তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভা উঠে পড়ে লেগে গেল মরা নাটকে ভরা জোয়ার আনতে।

১৮৫৭, ফেব্রুয়ারী মাস। সিমলার আশুতোষ দেবের বাড়ীতে অভিনয় হয়ে গেছে শকুন্তলার অভিনয়।

যখন মাত্র তেরো বছর বয়স, গড়লেন এক সমিতি। নাম বিদ্যোৎসাহিনী সভা। সেখানে প্রবন্ধ পাঠ করেন তখনকার সেরা লিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষেরা। যেমন প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, কৃষ্ণদাস পাল, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, অক্ষয়কুমার দত্ত। তখনকার সভায় বক্তৃতা বা রচনা পাঠ

জমে নি। দুমাস বাদে এপ্রিলে কালীপ্রসন্নর বাড়িতেই তৈরী হল নাটকের দল। অভিনয় হল, বেনীসংহার। দেশের মাথা-মাথা মানুষ এমন কি সাহেব সুবোরাও ছুটে এল নাটক দেখতে। প্রশংসা পেল। তবে মাঝামাঝি ধরণের। কালীপ্রসন্ন এবার নিজে অনুবাদ করলেন,

বিক্রমোর্বশী, বয়স তখন মোটে সতেরো। নভেম্বর মাসে অভিনয় হল সে-নাটক। কালীপ্রসন্ন নিজে নামলেন পুরুরবার ভূমিকায়। তাতে অভিনয় করেছিলেন আর একজন বিখ্যাত মানুষ। উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। নাটক দেখে মুখে মুখে, কাগজে-কাগজে ধন্য-ধন্য রব। স্যার সিসিল বীডন তখন ভারত সরকারের সেক্রেটারী। তিনি কালীপ্রসন্নর অভিনয় আর নাটক নিয়ে এই উদ্যমের জন্যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দু-বছর পরে অনুবাদ করলেন আর একটা নাটক, মালতী মাধব।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখনকার কালের একজন পণ্ডিত মানুষ। ঠিক করলেন একটা মাসিক পত্রিকা বের করবেন ইংরেজীতে। নাম হবে, মুখার্জি'স ম্যাগাজীন। কিন্তু না-আছে টাকা, না পয়সা। থাকার মধ্যে শুধু উদ্যম। কথাটা কানে এল কালীপ্রসন্নর। তিনি কিনে দিলেন ছাপার মেশিন।

স্বদেশপ্রাণ বলতে সত্যিই যা বোঝায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর কাগজ, 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গরীব প্রজাদের পক্ষ নিয়ে হিন্দু পেট্রিয়ট-এর পাতায় পাতায় আগুন ছোটাতেন তিনি। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও বিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভারতবাসীর স্বাধীন মতামত। এই হরিশ্চন্দ্র যেদিন মারা গেলেন, দেশের সাধারণ মানুষ চাষি-ভুষি কেঁদে উঠলো ডুকরে। যেন মারা গেছে আপনজন কেউ। সাধারণ মানুষের বেদনা থেকে জন্ম নিল গান।

"অসময়ে হরিশ মল, লংঙের হল কারাগার।"

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট'এর কী হবে, এই চিন্তায় সকলের কপালে যখন দুশ্চিন্তার রেখা, কালীপ্রসন্ন এগিয়ে এলেন সাহস করে। পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে নিলেন পত্রিকার স্বত্ব। পাঁচহাজার টাকা দান করলেম হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার জন্যে। হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগ আর তেজস্বিতার বিষয়ে নিজে লিখলেন ছোট্ট একটা পুস্তিকা।

অমিতাক্ষর ছন্দে কবিতা লিখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাই নিয়ে সারা দেশে তোলপাড়। অল্প কিছু বিদ্বান মানুষ এই নতুনকে জানালেন স্বাগত। বাকীরা নিন্দায় মাতিয়ে তুললে আকাশ-বাতাস। কালীপ্রসন্নর রক্তে গোঁড়ামী নেই। নিজের বিদ্যোৎসাহিনী সভা থেকে আয়োজন করলেন মাইকেল সম্বর্ধনার! লেখালেন অভিনন্দন পত্র! সমবেত হলেন দেশের সুধীমানুষেরা। 'মহাকবি' সম্বোধন করে কালীপ্রসন্নই প্রথম শিক্ষিত সমাজে পাকা আসন পেতে দিলেন মাইকেলের জন্যে।

দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন 'নীলদর্পণ' নাটক, নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারে চাষীদের লাঞ্ছনা অপমানের জলজ্যান্ত ছাপ ফুটিয়ে! সে নাটককে ইংরেজরা যে দুচক্ষে দেখতে পারবে না সে তো জানা কথাই। ইংরেজরা রাগে গরগর করবে জেনেও, মাইকেল মধুসূদন সেটাকে অনুবাদ করলেন ইংরেজীতে। পাদরী লং সাহেব সেটা বের করলেন ছেপে। তাতে আসল অনুবাদকের নাম ছিল না। নাম ছিল, এ নেটিভ। ইংরেজের আদালতে বিচার হল তার। জরিমানা এক হাজার টাকা। লং-এর মাথায় হাত। এত টাকা কোথায় পাবেন তিনি। যাঁরা লং-এর গুণমুগ্ধ ভক্ত, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী, তাঁদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত। কী করে কারাবাস থেকে বাঁচাবেন লংকে। সেই দুঃসময়েই দেখা গেল এক বাঙালী যুবক আদালতের ভীড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছেন লং-এর দিকে। হাতে টাকার থলি। লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, কালীপ্রসন্ন। তিনি আগে থেকেই অনুমান করে নিয়েছিলেন কী ঘটবে। তাই কাউকে না জানিয়ে গোপনে টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়েই হাজির ছিলেন আদালতে।

কালীপ্রসন্নর জীবনে দেশপ্রেমের ঘটনা এক-আধটা নয়, অনেক। কিন্তু তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় কীর্তি দুটো। এক হল, মহাভারতের অনুবাদ। মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায়। এর পিছনে প্রবল উৎসাহ যুগিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। দ্বিতীয়টা হল হুতোম প্যাঁচার নক্সা। এটা চলতি বা কথ্য ভাষায় লেখা সেকালের আশ্চর্য এক ইতিহাস, সামাজিক দলিল। এ বইয়ের জুড়ি নেই আর। বড় হয়ে পড়বে। দেখবে মহাভারতের মতই অমৃত সমান।

মাত্র তিরিশ বছরের জীবন। তাতেই কত কাজ। তিনটে চারটে পত্রিকার সম্পাদক। গোটা পাঁচেক নাটক। নানাদিকে দান-ধ্যান। মহাভারতের অনুবাদ। অজস্র সভা সমিতির উদ্যোক্তা। স্যার ওয়েলস নামের একজন ইংরেজ বাঙালীদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিল খারাপ রকমের। কালীপ্রসন্নই উঠে-পড়ে মিটিং ডাকলেন এর প্রতিবাদে। সই যোগাড় করা হল দশ লক্ষ লোকের। বরখাস্ত হতে হল ওয়েলসকে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ায়ে নেমেছেন অনেকবার। তবু ইংরেজরা কালীপ্রসন্নকে সম্মান না দিয়ে পারেন নি। অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট আর

জাস্টিস অব পীস করেছিলেন কয়েকবার। কালীপ্রসন্ন সিংহ পরিবারে জন্মেছিলেন বলেই সিংহ নন। তিনিই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন সিংহের বল-বিক্রমে। এবার তাঁর জীবনের সবচেয়ে মজার ঘটনাটা শোন।

কালীপ্রসন্নর আমলে এই কলকাতা শহরে এমন একদল ব্রাহ্মণ পন্ডিত বাস করতেন, যাঁরা যে-কোন রকম প্রগতির বিরুদ্ধে টিকি নাড়তে ওস্তাদ। কালীপ্রসন্ন যথার্থ জ্ঞানী ব্রাহ্মণদের কাছে মাথা নীচু করতে রাজী। কিন্তু নিছক টিকি-নাড়া টুলো পন্ডিতদের উপর হাড়ে চটা। আর টিকি-নাড়া পন্ডিতদের জব্দ করার জন্যেই নিজের বাড়ীতে বানিয়েছিলেন একটা মিউজিয়াম। সেখানে কি থাকতো শুনলে হেসে লুটোপুটি খাবে তোমরা। থাকতো, সরু মোটা, পাতলা, নধর, কুচকুচে, মুচমুচে, লম্বা, বেঁটে নানান রকমের টিকি। বড় বড় ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে কেটে নেওয়া। প্রত্যেকটা টিকির গোছার গায়ে আঁটা থাকতো লেবেল। আর লেবেলের গায়ে লেখা থাকতো কোন টিকির কত দাম। কালীপ্রসন্ন বড় বড় ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে ডেকে এনে যার যত দাম তা দিয়ে কিনে নিতেন এসব। দেখতে-দেখতে এমন হল যে সারা দেশে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল, 'টিকি কাটা জমিদার।' টুলো 'বামুনরা কালীপ্রসন্নর নাম শুনলে ভয়ে ঠকঠক! এই বুঝি ক্যাচ করে কেটে নিলে তাদের কত সাধের টিকিরত্নটি।

এটা ফেলানো-ফাঁপানো গল্প। আসল ঘটনাটা অন্যরকম। কালীপ্রসন্নর বাড়ীতে কোনও একটা ব্রত পালনের দিন একজন ব্রাহ্মণকে দান করা হয়েছিল একটা গরু। ব্রাহ্মণ বাড়ী যাবার পথে গরুটা বিক্রী করে দিয়েছিল এক কসাইকে। বাতাসে উড়তে উড়তে সে খবরটা একদিন কানে পেঁছিল কালীপ্রসন্নর। তিনি লোক পাঠিয়ে ডেকে আনলেন ব্রাহ্মণকে। আর রেগে গিয়ে নিজের হাতেই কেটে দিলেন তার টিকিটা।

এই ঘটনাটাই নানা মুখে ঘুরে ঘুরে, ডালপালা ছড়িয়ে হয়ে উঠেছিল 'টিকি মিউজিয়াম।'

তোমাদের সিংহের গল্প শোনাব বলেছিলুম। বলতো, সত্যি সত্যি সিংহের গল্প শুনলে কিনা ?

ছড়া

শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য

১

তুমিও আছো, আমিও আছি,
সবাই আছে চৌদিকে,—
তালের বড়ায় গরম মশলা
বলব দিতে বৌদিকে।
কালকে যেটা অতীত ছিলো,
আজকেও তা বর্তমান,—
কাঁচকলাকে কারবাইডে
পাকিয়ে বলো মর্তমান!
ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবি,
টিকটিকি দেয় গিটকিরি,
মেওয়া কোথাও ফলছে নারে
জীবনবৃক্ষে তিনতিড়ি!

২

আদিকালে বেনজামিন,
দিয়ে গেছেন একজামিন।
উড়িয়ে ঘুড়ি আসমানে,
বিজলী ধরেন ফাঁসটানে।
এখন কিন্তু "লোডশেডিং"
দৈনিকেতে রোজ "হেডিং"।

রামমোহন ছিলেন সত্যিকারের তেজী পুরুষ। পালকিতে করে একবার তিনি ভাগলপুর শহরে কোথাও যাচ্ছেন। পথিমধ্যে অন্য একজন ইংরেজ রাজপুরুষের সঙ্গে দেখা। সে-সময়ে কালো আদমি সাদা সাহেবদের সামনে দিয়ে পালকি চেপে যেতে পারত না। সাহেব রামমোহনকে পালকি থেকে নেমে হেঁটে যেতে বললেন। রামমোহন সে কথায় কর্ণপাত না করে চলে গেলেন। পরে তিনি এ নিয়ে বড়লাটের কাছে এক কড়া চিঠি লেখেন। বড়লাট রাজপুরুষটিকে বেশ ধমক দিয়েছিলেন।

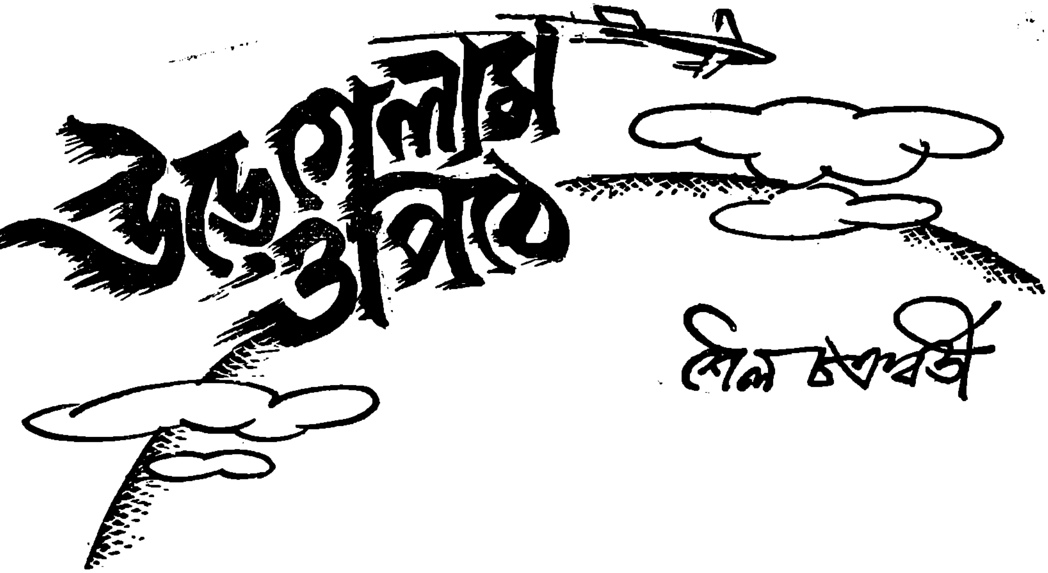

উড়ে গেলাম ওপিঠে। ওপিঠে মানে পৃথিবীর ও পিঠে। হ্যাঁ। সত্যিই, উড়েই গিয়েছিলুম। সেই উড়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত আর যেখানে গিয়েছিলুম সেখানকার কথাই বলছি।

নতুন একটা দেশের কথা বলবার আগেই একটা ঘটনার কথা বলে নিই।

একদিন সেখানে শহরের মধ্যে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছি নেমন্তন্নে। তাদের বিশাল ফ্ল্যাটের পাশে দেখি একপাল ছেলেমেয়ের ভীড়। রঙের বালতি রঙের পাত্র আর ব্রাশ হাতে নিয়ে তাদের জটলা।

আমি অমিতকে জিগ্যেস করলুম, এখানে কি আমাদের দেশের মত হোলি খেলা হয় নাকি?

অমিত বলল, না, এখানে হোলি হবে কেন? দেখুন না ওরা কি করে।

আমরা দর্শকের মত দাঁড়ালুম।

দেখি যে যার রঙ তুলি নিয়ে গেল দেয়ালের কাছে। একটা উঁচু দেয়াল সাদা রং করা।

তারপর হাতের কাছে যে যেখানে পারল সেই দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকতে লাগল। তাদের মধ্যে সাত থেকে ষোল বছরের ছেলেমেয়ে ছিল।

বড় মজার জিনিস ত!

ছোটরা যেমন ছবি আঁকে তেমনি আঁকছে তারা। কেউবা উঁচুতে আঁকছে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে।

আমরা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। ছোট্ট সোমা আমার নাতনি সে আর দাঁড়াতে চায় না।

প্রোফেসার সোমের বাড়ি গেলাম। সেখানে অনেকক্ষণ খোস গল্প চলল নানাবিধ চর্ব চোষ্যের সঙ্গে।

পরে যখন আবার সেই দেয়ালের কাছে আমাদের পার্ক করা গাড়িতে উঠতে গেলাম দেখি কি, সারা দেয়ালটা যেন একটা গ্যালারী! তার মধ্যে কত কি যে আছে তা আর কি বলব। বড় বড় চোখ-ওয়ালা বাচ্চার মুখ যেমন আছে তেমনি আছে নানা জীবজন্তুর ছবি। আবার অদ্ভুত দত্যি দানোর মূর্তিও বাদ নেই।

একখানা ইয়া লম্বা মোটর গাড়ির ছবি দেখে না হেসে পারলুম না। তখন অবশ্য খুদে আর্টিস্টরা হাওয়া হয়েছে। শুধু একজন হাতে তুলি লজ্জা-মুখে আমাদের দেখছিল।

এটা বলছি ব্রেজিলের একটা শহরের কথা। নাম করা শহর রিও-ডি-জেনিরো।

শুনলুম, ওখানে একদিন ওদের উৎসব হয় সেই সময় ছোটদের এই স্বাধীনতা দেয় মজার ছবি আঁকার জন্যে। ওরা খৃস্টান, রোম্যান ক্যাথলিক। খৃস্টমাসের মত 'হ্যালোইন' বলে একটা উৎসব আছে। সে সময় ওরা নানা ছবি এঁকে টাঙ্গায়, নানা মূর্তি তৈরি করে। আবার একটা কুমড়োর গায়ে ফুটো করে চোখ মুখ বানিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। ঐ সব দেখে নাকি ভূত প্রেত ভয় পেয়ে, আর আসবে না।

যাই হোক, আমার ভাল লাগল ওদের দেয়ালে ছবি আঁকা এবং সেটা আঁকল ছোটরা। ওদের দেশের নিয়ম কিন্তু দেয়ালে কোনো লেখা চলবে না। কাগজ সাঁটা চলবে না। কলকাতার মত দেয়ালে দেয়ালে কালি দিয়ে

পোঁচড়া বোলানো—ঈশ্‌! ওরা ভাবতেই পারে না।

শহরটা সুন্দর রাখার জন্যে ওদের আয়োজনের অন্ত নেই। বাড়ি অসুন্দর করে রাখার অধিকার নেই কারুর। শুনে আমার খারাপ লাগল, এ আবার কি? আমার বাড়ি আমি যেমন খুশী রাখব ত। তা নয়। তোমার বাড়ির রং যদি খারাপ হয়ে যায়, দাগ পড়ে, বা বালির কাজ খসে যায়, কিংবা সার্সির কাচ ভেঙে যায় তাহলে মুস্কিল। কি হবে জান? নোটিশ আসবে।

এইসব গলদ তাড়াতাড়ি সারিয়ে ফেলতে হবে। আর দেরী হলে জরিমানা দিতে হবে। আমার বাড়ি আমার খুশিমত বিদিকিচ্ছি করে রাখব তা চলবে না।

তোমার বাড়ি হোক, কিন্তু তা ত শহরের একটা অঙ্গ। শহর দেখতে গিয়ে কারুর না কারুর চোখ ত পড়বে সেখানে। তাহলে দোষটা হবে শহরেরই। বাইরে থেকে যারা বেড়াতে আসে, তারা বলবে, এ রাম, শহরে সব আছে কিন্তু শ্রী নেই।

তা সত্যি, এই কড়া নিয়ম আছে বলেই শহরটা তোমরা যদি দেখ অবাক হয়ে যাবে। ঝক্‌ ঝক তক্‌ তক্‌ করছে। যেমন বাড়ি ঘর বাগান তেমনি রাস্তা।

আচ্ছা, দেয়ালের ছবি থেকেই এত কথা এসে গেল। তার আগের কথা কিছুই ত তোমাদের বলা হয়নি।

আমি কলকাতার লোক, স্বভাবে ভীষণ কুঁড়ে। বেশী নড়ারচড়ার মোটেই পক্ষপাতী নই। তাই বলে ভেব না, আমি কোথাও যাইনি। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় গেছি, বেড়িয়েছি। আবার অনেক অনেক জায়গায় যাওয়া হয়নি। সে সব জায়গার কথা উঠলে মন খারাপ

হয়ে যায়। দেখা হয়নি বলে।

ঘুরে বেড়ানোর একটা মজা আছে তা তোমরাও স্বীকার করবে। কত নতুন জিনিস দেখা যায়। নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়। প্রকৃতির কত রকমারি দৃশ্য চোখে পড়ে। জল স্থল নদী পর্বত অরণ্য শহর নিয়ে পৃথিবীটা কত জায়গায় যে কত রকমে সাজিয়ে ছবি করে রেখেছে সে কি কম রোমাঞ্চকর! রিও-ডি-জেনিরো এই রকম একটা অসংখ্য ছবির দেশ।

এবারে একটু ভূগোলের কথা বলি।

ব্রেজিল দেশটা হল দক্ষিণ আমেরিকায়, ওটাকে লাটিন আমেরিকাও বলে। বিশ্ববিখ্যাত পেলের জন্যে ব্রেজিলের

নাম এখন তোমাদের সবার জানা। গোলকটা দেখলে বুঝতে পারবে। আমরা যেখানে আছি, এই দেশটা হল ঠিক তার উল্টো দিকে, মানে অপর গোলার্ধে। তাই বুঝে দেখ দূরত্ব কতখানি। পৃথিবীকে প্রায় আধ পাক ঘুরলে তবে ওখানে পৌঁছানো যাবে। প্রথম পর্তুগীজরা গিয়েছিল জাহাজে করে। এখনো জাহাজ চলছে মাল-পত্তর নিয়ে। কিন্তু যাত্রীর পক্ষে আকাশ পথই সবচেয়ে ভাল। টিকিট কেটে শুধু প্লেনে চাপা আর নামা। তাও আমাদের সময় লেগেছিল উত্তর আমেরিকা ঘুরে ওখানে যেতে ৩২।৩৩ ঘণ্টা।

আমার কি আর অতদূর যাওয়া হত, কোনোদিন ভাবিও নি যে যাব ঐ দেশে। কিন্তু মেয়ে জামাই আর নাতনি থাকে ওখানে। তাদের ইচ্ছে আমি একবার গিয়ে বেড়িয়ে আসি। ভাল জিনিস নতুন জিনিস দেখলে আপনার লোককে দেখাতে ইচ্ছে করে ত।

যাই হোক, যখন ঠিক হল, তখন পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি সংগ্রহ করে যাত্রা করলুম। যেতে হবে দিল্লী থেকে প্যানাম প্লেনে।

আমার আবার এই প্রথম প্লেনে চড়া। ভেবেছিলুম বাঙ্গালী সহযাত্রী পাব কিন্তু হায়, একজনেরও টিকি দেখতে পেলুম না। কি আর করি, একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক মালহোত্রর সঙ্গে আলাপ করে একটু জমিয়ে নিলুম। দুটো কথা ত বলতে হবে। গল্প না করলে মজাটা পুরো ভোগ করা যায় কি?

আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, তাই একটা বেকুবির গল্প বলছি। প্লেনে বসার জায়গাগুলো খুব আরামের।

তুমি সোজা হয়ে বসতে পার আবার ঠেসানটাকে হেলিয়ে আধশোয়া হয়েও বসতে পার। এই কৌশলটা শিখতে হল আমায়। সামনে কিন্তু সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে। কখন কোমরে বেল্ট এঁটে নিতে হবে সেটা জানিয়ে দিচ্ছে আলোর লেখা দিয়ে। সিগারেট খাওয়া সব সময় চলে না। সেও সঙ্কেত দেখে বুঝে নিতে হবে। প্রত্যেক সীটের সঙ্গে নানা রকমের সুইচ। তার একটা টিপলে একটা খুদে আলো জ্বলে উঠবে মাথার ওপর। সেটা জ্বললে হোস্টেস চলে আসবে তোমার কাছে। জিগ্যেস করবে, কি চাই? আবার যদি বই পত্র পড়তে চাও, আলো কম লাগছে তাহলে একটা সুইচ টিপলে ঠিক সামনে বই এর ওপর সরু একটা পেন্সিল লাইট এসে পড়বে। তাতে আশে পাশের কারুর চোখে পড়ে ব্যাঘাত করবে না।

তোমরা প্লেনে চাপলে এ সবই শিখে নেবে। আমিও একে একে রপ্ত করলুম। কিন্তু সবটা কি সব সময় মনে থাকে। একবার সিগারেট ধরিয়েছি একটু পরে হোস্টেস ছুটে এসে সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল NO SMOKING লেখা জ্বলছে। বেল্ট বাঁধার ব্যাপারেও কতবার এমনি ভুল হয়েছে।

দিল্লী থেকে প্লেন ছাড়ার পরে যে বেকুবি করেছিলুম তাই বলছি।

হোস্টেস মেয়েটি তখন চা কফি সার্ভ করছে। প্রত্যেককে জিগ্যেস করছে চা না কফি?

আমি বললাম, কফি।

আমার সামনে টেবিলে ট্রে করে খালি কাপ প্লেট চামচ ও বিস্কিট রেখে গেল একজন। আর একজন টি-পট থেকে লিকার ঢেলে দিয়ে গেল আর তার সঙ্গে দুটো ছোট্ট পুরিয়া দিয়ে গেল।

আমার পাশে মালহোত্র দেখি রঙ্গিন কাগজের প্যাকেট ছিঁড়ে চিনি ঢেলে মিশিয়ে নিল চামচ দিয়ে। আমিও তাই করলুম! কিন্তু দুধ কোথা? অনেকে 'র' লিকার খায়। আমি দুধ ছাড়া কফি খেতে পারি নে।

পাশ দিয়ে হোস্টেস যাচ্ছিল, ডাকলুম। বললুম, দুধ দাও।

সে বলল, কেন, তোমায় দেয়নি?

আমি বললুম, কোথা?

সে তখন আমার টেবিলে পড়ে থাকা সেই ছোট্ট প্যাকেটটা তুলে ধরল! এবং একটু হাসল।

মালহোত্র বলল, আরে চকরবর্তী, ওতেই ত দুধ আছে।

তাই নাকি? পুরিয়া ছিঁড়ে সবটা ঢেলে দিলুম কাপে! দেখি ঠিক এক কাপের মত গুঁড়ো দুধ ছিল ওতে।

মালহোত্র বলল, তুমি মেয়েটিকে হাসিয়েছ।

আমি বললুম, ওরা সব সময়ই একটা হাসি হাসি মুখ নিয়ে থাকে। তার ওপর আর একটু বেশি না হয় হাসল।

মালহোত্র হেসে উঠল।

আমি ঠকব কেন? আবার সেই মেয়েটিকেই ডাকলুম। বললুম, More milk please!

সে ছুটে গিয়ে আর একটা দুধের পুরিয়া দিয়ে গেল।

এমন সময় কানে এল, একজন মাইক নিয়ে বলছে আমরা ৩৫০০০ ফুট ওপর দিয়ে চলছি পনেরো মিনিট পরে আমরা পৌঁছুব তেহারাণে।

মাথার ওপর কটকটে রোদ্দুর। তেহারাণ এয়ার পোর্টে আমাদের প্লেন ল্যাণ্ড করল। সবাই নামছে আমিও নামলুম, কাঁধে কিট ব্যাগটা।

ওখানে একটা ট্রলি করে বেশ খানিকটা ঘুরে আসা গেল। অবশ্য এয়ারপোর্টের বাইরে নয়। নানা জিনিসের সাজানো দোকানপাট। সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছে কেউ কেউ কেনা কাটাও করল। প্লেন ছাড়বার কথা ঘণ্টা দুই পরে।

ফিরে এসে আবার যে যার সীটে। আবার টেক্ অফ্।

এবারে আমরা এলুম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট্ এয়ার পোর্টে। এখানে বেশিক্ষণ নয়, ঘণ্টা খানেক। অনেক যাত্রী নামল, অনেক উঠল।

দেখি একদল জাপানী ছাত্র ছাত্রী উঠেছে। সবার হাতে নয় কাঁধে একটা করে ক্যামেরা। আর সে ক্যামেরা কি অদ্ভুত দেখতে! কোনটার লেনসটাই আধ হাত লম্বা। জাপানীদের দেখলে আমার খুব মজা লাগে! ওরা হাসলে চোখটা দুটো রেখায় এসে যায়।

এতক্ষণে প্লেনের অভ্যন্তরভাগ বেশ পরিচিত হয়ে গেছে আমার কাছে। কেবল ইচ্ছে করছিল উঠে একটু হেঁটে বেড়াই। পেছন দিকে ল্যাভেটরী, সেদিকে ত যেতেই হয়, সেই সঙ্গে জানালার ফাঁকটুকু দিয়ে নীচের দৃশ্য দেখার জন্য মনটা ছটফট করছিল।

জানালার কাচে মুখ লাগানো একটি জাপানী মেয়েকে বললুম, তুমি কি ছবি তুলবে? নীচের ছবি?

সে বলল, হ্যাঁ।

বললুম, কিছু মনে করো না, আমি একটু নীচেটা দেখব।

সে সহাস্যে জায়গা ছেড়ে দিল।

নীচে তাকালুম। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। প্রথমে ধোঁওয়া ধোঁওয়া মেঘ কিছু দেখা যায় না। সেটা সরে গেল। চলচ্ছবির মত দৃশ্য পাল্‌টাচ্ছে! অনেক দূরে যেন কে আধুনিক আর্টের মত প্যাচ্ দিয়ে নানা রং লাগিয়ে রেখেছে। সরে গেল সেটা, এল খানিকটা সবুজ! তার পাশে নুড়ির মত সাজানো যেন খেলা ঘরের বাড়ি। সরু সুতোর মত আঁকা বাঁকা রাস্তা! তার ওপর দিয়ে পোকার মত কি যেন সব চলছে। ও হরি, ও গুলো যে মোটর-কার তা খেয়াল হল যখন হঠাৎ তাদের চক্ চকে পিঠ থেকে রোদ্দুর ঠিকরে রং বেরঙের তারাবাজির মত দেখাল! গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ির পাশে চৌকো লম্বা জমি ধূসর পিঙ্গল কত রঙের—আসলে ওটা একটা যে প্রকাণ্ড শিল্প সমৃদ্ধ শহর শূন্য মার্গ থেকে তা বোঝা শিবের অসাধ্য।

ফ্রাঙ্কফুট থেকে পক্ষিরাজ আমাদের নিয়ে গেল একেবারে লণ্ডনের হিথরো পোর্টে।

মনের মধ্যে এতক্ষণ ঝড় বইছিল কখন লণ্ডন আসবে—ওখানে এলেই দেখা হবে মমতাদের, মানে, আমার মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে। ওরা য়ুরোপ সেরে ঐ একই প্লেনে আমার সঙ্গে যোগ দেবে এবং একসঙ্গে যাব ন্যুইয়র্ক।

তাই হিথরোতে প্লেন থামতেই জেনে নিলুম আমাদের চেঞ্জ করতে হবে না। ঐ প্লেনই যাবে!

চক্রবর্তী চলুন, মালহোত্র বলল, একটু ঘুরে আসা যাক।

আমি বললুম, মাপ করো, তুমি ঘুরে আসতে পার। আমাকে মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এই গ্যাংওয়েতে আমি দাঁড়াব—ওরা এলে কি মজা হবে বুঝতেই পাচ্ছ।

মালহোত্র বলল, ইউ আর লাকী। তোমার আপনার জনকে প্লেনেই পেয়ে যাচ্ছ। আর আমার, দেখত, ন্যুইয়র্কে পেঁছে চার ঘণ্টা বসে থেকে তারপর অন্য প্লেন ধরে তবে ছেলের কাছে California পেঁছব।

আমি প্যাসেজের কাছে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নেই বলব, তাকিয়ে আছি কখন আসে ওরা।

ও হায়! সময় চলে যাচ্ছে, কত যাত্রী লটবহর নিয়ে টলতে টলতে ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল। কিন্তু এল না ওরা। মনটা খুবই দমে গেল। কেন এল না? কি হল? টেলিফোনে কথা হয়েছে, মানে, ব্রেজিল থেকে কলকাতা। তারপর আমি জানিয়েছি টেলিগ্রামে। চিন্তিত হয়ে পড়লুম।

ছাড়বার সময় হল প্লেনের। যারা ঘুরতে গিয়েছিল সবাই এসে ঢুকল। ওদের অফিসার জানাল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্লেন ছাড়বে। যে যার সীটে গিয়ে বসো—

দেখি মালহোত্র আগেই এসে গেছে। আমায় দেখে বলল, কই তোমার মেয়ে জামাই সব কোথা?

বললুম, ওরা আসেনি! তোমার কথা ফলল না! ইটস্ এ ব্যাড্ লাক ফর মি—

ও আমায় অনেক আশ্বাস দিল কিন্তু মনটা খারাপ হয়েই রইল। ভাবনা শুধু নয় ভয়েরও কথা। কাছে দুটি টেলিফোনের নম্বর—তারাও থাকে অনেক দূরে। আর মানিব্যাগে মাত্র ছ'টি ডলার। ও দেশে আমাদের ছ'টাকার মত। কোনো হোটেলে ওঠা যাবে না। ট্যাক্সি করে দূরে যাওয়া যাবে না। অথচ উপায়ই বা কি?

ঘড়িতে দেখলুম সাড়ে ছ'টা। মানে সন্ধ্যা। কিন্তু বাইরে চোখ ঝলসানো রোদ।

প্লেন চলছে। এবারে আর হল্ট নেই থামা নেই নামা ওঠা নেই। একটানা চলবে দশ ঘণ্টা। শুনে যেন

মনটা শিউরে উঠল, একটানা দশঘণ্টা আর যাবে আটলাণ্টিকের আকাশ ভেদ করে।

লাঞ্চ এসে গেল। সে কি খাবার! চমৎকার খান দুই বড় বান রুটি, চীজ মাখন জেলির প্যাকেট; বড় প্লেটে চিকেন রোস্ট। এক বাটি আনারস কুঁচো আর চেরী, স্যালাড, আর ডেজার্ট হিসেবে বড় একটা আইসক্রীম। এত খেতে পারে মানুষ। এক মহিলা বুড়ী দেখি চটপট হাত চালিয়ে একটার পর একটা নিঃশেষ করতে লাগল!

ঠিক আমার ডানদিকে বসেছিল একটি তরুণী!

জিগ্যেস করলুম, কোথা যাবে?

বলল, আমেরিকা।

কোথা বাড়ি তোমাদের?

রোমানিয়া।

বললুম, নাদিয়াকে চেন, যে অ্যাক্রোব্যাটিকে অলিম্পিকে প্রাইজ পেল। হেসে বলল, হ্যাঁ, খুব চিনি, আমাদের দেশের মেয়েত, খুব বাচ্চা। তারপর বলল, কিছু মনে করো না। আমি ইংরেজি জানি না।

আমি বললুম, তাতে কি হয়েছে।

হাতে একটা card নিয়ে বলল, এটা fill up করতে হবে ত। profession মানে কি? father's profession আছে এখানে কি লিখব?

বললুম, তোমার বাবা কি কাজ করেন?

বলল, ট্রাক চালায়। ঐত সামনে বসে আছে! মা আছে। দিদি ওদিকে বসেছে। ঠাকুমাও আছে—

ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরিজিতে বলছিল। আমি বললুম ওখানে লেখ truck driver—

ওর ইতস্তত ভাব দেখে আমিই লিখে দিলুম।

জিগ্যেস করলুম তোমার বয়েস কত?

বলল, পনেরো বছর।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম, ওর বিরাট চেহারা আর সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে। আমার মনে হয়েছিল বাইশ/তেইশ হবে। আমার ঐটুকু সাহায্য করার জন্যে কী মিষ্টি করে ধন্যবাদ দিল। মুখে তখন দেখলুম সরল শিশু-সুলভ হাসি।

কি খুব কাজে ব্যস্ত মনে হচ্ছে—মালহোত্র আমায় ডেকে বলল, খাওয়াটা খুব চাপ হয়ে গেছে—

আমি বললুম, আমি ত অনেক কিছুই খাইনি। কিন্তু ঐ বাঁকারির মত চেহারা চটকদার পোষাক পরা বুড়ী চেটে পুটে সব খেয়েছে।

ও বলল, আরে ওরা ত রাক্ষসের মত খায়।

এরপর এল কফি।

উঠে গিয়ে নীচে তাকালুম কয়েকবার! নীলাভ চাদর যেন টান করে পাতা রয়েছে—ঐ হল আটলাণ্টিক। ম্যাপ থেকে দেখেছি এই সেই অশান্ত রুদ্রমূর্তি চঞ্চল আটলাণ্টিক।

দিনের আলো চলছে তখনও। আশ্চর্য হলুম, সেই কখন দিল্লীতে দিন শুরু হয়েছে তারপর আমার হাতের ঘড়ির ছোট কাঁটা প্রায় দুপাক ঘুরে গিয়েছে—আর এখনও সেই দিন চলছে।

একটানা দশঘণ্টা উড়ে আমাদের পক্ষিরাজ যখন নুাইয়র্ক পোর্টে নামল তখন সবে সন্ধ্যে হচ্ছে। তার মানে, দিল্লীর শুরু হওয়া দিন ২৩ ঘণ্টা পরে সন্ধ্যার কোলে ঢলে পড়ল। এবং আরও আশ্চর্য যে ৩১শে জুলাই তারিখে রওনা হয়েছিলুম। ওখানে গিয়ে দেখি সেদিনও ঐ তারিখ। মালহোত্রকে বলতে সে বলল, আরে মশাই, এদিকে আসার ঐ একটা লাভ মানে time gain করা।

আমি বললুম, ব্যাপারটা আর কিছু নয়। সূর্য্যিদেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একই দিকে ছুটেছি ত আমরা—

আবার নামো নামো রব।

নামার পর যা হল তা আর এক গল্প।

স্বপ্নে ভেজা

সমরেশ মন্ডল

বৃষ্টি এলো টাপুর টুপুর
বৃষ্টি এলো ঝমঝম
রাস্তা দিয়ে ছুটছে তবু
এক্কা গাড়ি টমটম।

ভিজল দেয়াল ভিজল বাড়ি
বাইরে মেলা দিদির শাড়ি।
এঘর থেকে ওঘর যাওয়া
এখন হোল বন্ধ

এখন যদি মেঘের পাখা
পুপুর হাতে আসে
হাওয়ায় তবে ভাসে—
পেরিয়ে নদী সাগর নালা
পেরিয়ে খানা খন্দ—

কোথায় যাবে, ভাবতে ভাবতে
স্বপ্নে ভেজা দু চোখ হোল অন্ধ।

মানুষখেকোর সন্ধানে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

সেবার সুন্দরবনে বাঘের খুব উপদ্রব বাড়ল। সেবার বলতে অবশ্য আজ থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা। তখন সুন্দরবনের আইন কানুন একটু অন্যরকম ছিল। এখন যেমন পারমিট ছাড়া ওখানে ঢোকার উপায় নেই, তখন অত কড়াকড়ি ছিল না। তখন হামেশাই লোকে জঙ্গলে ঢুকে কাঠকুটো কেটে আনত, বুনো মুরগীর ডিম কুড়িয়ে আনত, আর মধুর তো কথাই নেই। কলসী কলসী মধু আনত। জঙ্গলের ধারে যাদের বাড়ি তারা জঙ্গলের উপর নির্ভর করেই জীবন ধারণ করত। তা বাবু, আমার বাড়িটাও ছিল একেবারে জঙ্গলের লাগোয়া। আমাদের গ্রাম যেখানে শেষ হল, সেখানে একটা নদী, নদীর ওপারেই জঙ্গল। রাত বিরেতে বাঘের ডাক আমরা হামেশাই শুনতাম।

ঘরে একটা ওয়ালল্যাম্প জ্বলছিল। কেমন ছমছম আলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে ঘুটঘুটি অন্ধকার চোখে পড়ে। সেই অন্ধকারে জঙ্গলের দিকে দেখা যায়, অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে। আমি হাঁ করে সন্যা বাওয়ালীর বাঘ মারার গল্প শুনছিলাম। লোকটাকে প্রথম থেকেই আমার একটু অন্য রকম মনে হচ্ছিল।

সন্যা বা সন্যাসী বাওয়ালীর পরনে একটা কানি। বেশ লম্বা হাড় জিরজিরে চেহারা, সারা গায়ে অনেক কাটাকুটির দাগ। ওগুলো যে জঙ্গলেরই চিহ্ন তাতে সন্দেহ নেই! ওর কাঁধের ওপর একটা নোংরা গামছা ঝুলছিল। গামছা দিয়ে একবার মুখ মুছল। আবার ওটাকে কাঁধে ফেলে বলতে শুরু করল, তা বাবু সেবার সোঁদর বনে বাঘের উপদ্রব বাড়ল। কানা ঘুষায় শুনতে পেতাম, অমুক জঙ্গলে একটা মানুষ খেকো বাঘ হামেশাই নাকি মানুষ খাচ্ছে। আর বাঘ যদি একবার মানুষের স্বাদ পায়, তা হলে জঙ্গল ছেড়ে অনেক সময় লোকালয়ের দিকেও এগিয়ে আসে। মাঝে মাঝেই খবর আসত, বাঘটা নাকি গ্রামে ঢুকে গরু তুলে নিয়ে গেছে। কিংবা গ্রামের সদর রাস্তায় নাকি বাঘের শ্রীচরণের দাগ দেখা গেছে। আমি আগ্রহ নিয়ে শুনতাম কিন্তু গা করতাম না।

—কেন? গা করতে না কেন? আমি সপ্রশ্ন তাকালাম।

সন্যা বাওয়ালী হাসল, গ্রামের লোকগুলো বড় গুজব ছড়াতে ভালোবাসত বাবু। আমি ভাবতাম ঘটনা যদি এইটুকু হয়, লোকে তাকে এত বড় করে বলতে ভালোবাসে। তখনকার মানুষগুলোই ছিল অন্যরকম।

আমার একপাশে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসে চুরুট টানছিল সনাতনবাবু। উনি এখানকার ফরেস্ট অফিসার। ওর চিঠি পেয়েই জঙ্গল দেখার লোভে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম। কাঠের বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটার ওপাশে কিচেন সেড। সেখানে কুকারে মাংস চাপিয়েছে ভলগু। একটু একটু মাংসের গন্ধ এসে মাতোয়ারা করে দিচ্ছিল মাঝে মাঝে।

সন্যা শিকারী বলতে শুরু করল, তা বাবু প্রথম দিকে গুজব বলে উড়িয়ে দিলেও পরে আর তা উড়িয়ে দিতে পারি নি। হঠাৎ একদিন আমাদের গ্রামের চৌকিদারের মুখে শুনতে পেলাম, আট দশ মাইল দূরের একটা জঙ্গলে সত্যি সত্যি নাকি মানুষ খেকো বেরিয়েছে! মাস দুয়েকের মধ্যে সত্যি সত্যি ও পাঁচজন কাঠুরে আর মউলিকে হজম করে বসেছে। ফরেস্টবাবুরা বাঘটাকে শায়েস্তা করার জন্য শিকারী লাগিয়েছিলেন কিন্তু তাতেও কোন ফল না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, কেউ যদি বাঘটাকে মেরে আনতে পারে তাকে পাঁচশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

পুরস্কারের কথা শুনেই বাবু আমার মাথা ঘুরে গেল। তখনকার দিনে পাঁচশ' টাকা মানে অনেক টাকা। পুরস্কারের লোভ কে সামলাতে পারে! ঠিক করে ফেললাম, জঙ্গলে ঢুকব! যে ভাবেই হোক বাঘটাকে মারব। দেখিয়ে দেব, পাকা শিকারীরা যা পারে নি, আমি তাই করেছি।

—তোমার বয়স কত তখন? প্রশ্ন করলাম।

সন্যা বলল, আজ্ঞে বাবু কত আর, এক কুড়ি হবে। তখন ঘুঁষি দিয়ে নারকেল ফাটাতে পারি। হাসল ও!

সনাতনবাবু বললেন, ও বেটার অসাধ্য কাজ কিছুই ছিল না। তারপর কি হল বল সন্যা? বাবু কিন্তু তোর গল্প শোনার জন্যই কলকাতা থেকে কষ্ট করে এখানে এসেছে।

চার পাঁচ জনের একটা ছোট্ট দল গড়ে ফেললাম বাবু। দুটো দিশী বন্দুকও জোগাড় হয়ে গেল। তা ছাড়া দা, কাটারি, কুড়ুল, দড়িদড়া সব কিছুই নৌকায় তোলা হল। সাধারণত শিকারে বেরুলে তিন চার দিনের আগে ফেরা যায় না, তাই তিন চার দিনের মতো চিড়ে মুড়ি গুড় বেঁধে নেওয়া হল। সোঁদর বনে কোথাও খাওয়ার জল পাওয়া যায় না বলে তিন চার হাঁড়ি জলও তুলে নেওয়া হল।

তা, আমাদের দলে আমি ছাড়া বাকি চার জনই ছিল

জেলে। নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়ায়। জাল বিছিয়ে মাছ ধরাই ওদের পেশা। ওরা ওদের বেড় জালও নৌকাতে তুলে নিল। বলল, রথ দেখা কলা বেচা দুটো কাজই একসঙ্গে করব। অর্থাৎ বাঘও মারব, আবার মাছও ধরব।

জাল বিছোলেই মাছ ধরা যায়। কিন্তু বাঘ মারা তো অত সহজ নয়। ফলে বললাম, দেখ হে, বাঘ মারতে হলে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে। সারাদিন সারারাত হয়তো গাছাল দিয়ে বসে থাকতে হবে, মাছটা ধরবে কখন শুনি?

বৈকুণ্ঠ জেলে বলল, জালটা সঙ্গে থাকছে থাক না! তেমন যদি সুযোগ সুবিধা আসে তা হলেই মাছ ধরার কথা চিন্তা করব, নইলে নয়।

শেষ পর্যন্ত ওদের কথায় রাজি হলাম। জাল সমেত আমরা নৌকো ভাসালাম। আট দশ মাইল খুব একটা বেশি দূরের পথ নয়। একটা ভাটাতেই পৌঁছে যাওয়ার কথা। ভাটা শুরু হতেই বিকেলের দিকে আমরা বন-বিবির নাম নিয়ে দাঁড় বাইতে শুরু করলাম।

বাংলোর বাইরে বোধ হয় চাঁদ উঠতে শুরু করেছিল। জঙ্গলের দিকটা কেমন একটু অন্য রকম দেখাতে শুরু করল। কিন্তু জোনাকির আলোগুলি তখনো অদ্ভুত রহস্য হয়ে ওদিকে জ্বলছিল নিভছিল। আমি হাঁ করে সন্যা বাওয়ালীর গল্প শুনছিলাম।

ভলগু আমাদের চা দিয়ে গেল।

সনাতনবাবু চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে আবার একটা নতুন চুরুট ধরালেন, হুঁ, তারপর কি হল বল?

সন্যা বাওয়ালী আবার বলতে শুরু করল, তা বাবু নৌকো নিয়ে জঙ্গলের ধার দিয়ে দিয়ে আমরা এগোতে শুরু করলাম। ভাঁটা বলে নদীর পারে চন্দনের মতো কাদা জমতে শুরু করেছে। সেই কাদায় নোনা কুচে মাছ আর লাল কাঁকড়ার ছুটোছুটি দেখতে দেখতে আমরা এগোতে লাগলাম। মাঝে মাঝে শামুক খোল পাখি এসে কাদার পরে শিকার ধরার জন্য ওত পেতে বসে। কখনো বা জঙ্গলের মধ্যে সর সর করে কি যেন ছুটে যেতে দেখা যায়, আমরা চমকে চমকে উঠি। দিশী বন্দুকে টোটা ভরে তৈরি হয়ে থাকি, না কিছুই না।

সারা রাস্তায় বাঘের দেখা পাওয়া তো দূরের কথা হরিণ কি বুনো শুয়োরও আমাদের চোখে পড়ল না। একবার বুনো মুরগী উড়তে দেখেছিলাম, দেখে খুব লোভ হয়েছিল। বৈকুণ্ঠকে বললাম, কি কর্তা, নেমে একবার ডিম কুড়োবার জন্য ঘুরে দেখবে নাকি?

—বুনো মুরগী কি যেখানে সেখানে ডিম পেড়ে রাখে নাকি? প্রশ্ন করলাম।

সন্যা উত্তর দেওয়ার আগেই সনাতনবাবু বললেন, এই বুনো মুরগীর ব্যাপারটা ভারী অদ্ভুত। গ্রামের লোকেরা অনেক সময় জঙ্গলে ঢুকে বনবিবির নামে মুরগী মানত করে ছেড়ে দিয়ে আসে। সেই মুরগী গুলোই বনের মধ্যে বাস করতে করতে বুনো মুরগী হয়ে ওঠে। ওরা পাখির মতো বেশ খানিকটা উড়তেও পারে। আর ডিম পাড়ে গাছের খোঁদলে। সেইখানেই বসে তা দেয়। গাছের এমন জায়গায় বসে ওরা ডিমে তা দেয়, যেখানে বনের কোন হিংস্র জানোয়ার ওদের আক্রমণ করতে পারে না।

—হ্যাঁ বাবু, ভীষণ চালাক হয়ে যায় ওগুলো। ওদের ধরতে হলে ফাঁদ পেতে রাখতে হয়। তবে জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে প্রায়ই ওদের ডিম দেখা যায় গাছের কোটরে।

চায়ের কাপটা একপাশে সরিয়ে রাখলাম।

সন্যা বাওয়ালী আবার শুরু করল, তা বাবু যা বলছিলাম, আমরা নৌকো বাইতে বাইতে সন্ধ্যার কিছুটা আগে হঠাৎ এক জায়গায় একটু থমকে দাঁড়ালাম।

বৈকুণ্ঠ জেলে চেঁচিয়ে উঠল, সন্যা ও সন্যা ঐ দ্যাখ!

—কি গো বৈকুণ্ঠদা? কি?

—ঐ যে ঝোপের পাশে মাটির দিকে তাকা।

তাকালাম। গা শিউরে উঠল আমার। একটা নোংরা কাপড় পড়ে আছে, কাপড়টা গাছের ডালে খানিকটা জড়ান। আর ঠিক তার কাছেই মাটিতে কয়েকটা পায়ের ছাপ। বুঝতে অসুবিধা হল না, ও গুলি বাঘেরই পায়ের চিহ্ন। ছাপগুলির ওপর দিয়ে দু তিনটে জোয়ারও হয়তো পার হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো বেশ স্পষ্ট।

এই কাপড় আর পায়ের ছাপ দেখে সন্দেহ রইল না, বাঘটা ধারে কাছেই থাকতে পারে।

জেলেদের তো মুখ শুকিয়ে আমশি। বৈকুণ্ঠ জেলে বলল, বাঘটা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেকে আমাদের দিকে নজর রেখেছে কিনা কে বলবে। ও সন্যা ভাবগতিক কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না আমার।

বাঘ মারতে এসে ভয় পেলে চলে না। বাঘ মারতে সবচেয়ে আগে যেটি দরকার হয় তা হচ্ছে সাহস। আমি ওদের সাহস দেবার চেষ্টা করলাম। বললাম ভয় পেলে চলবে না। সব সময় মনে রাখতে হবে, বাঘ যেমন আমাদের যম, আমরাও তেমনি বাঘের যম। ঠিক করলাম আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আমরা নৌকো নোঙর করব। তারপর সারারাত জেগে বসে চার পাশে পাহারা দেব।

—কাপড়টার কি হল? প্রশ্ন করলাম।

সন্যা বলল, কাপড়টা যার সে তো বাঘের পেটেই গেছে

জেলেদের মন মাছের দিকেই বেশি থাকে, ওরা মাছের লোভ সামলাতে পারল না। আমার বারণও শুনল না। বিরাট বেড় জালটাকে নৌকো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করল। জালের কাঠিগুলি জলের ওপর ভাসতে শুরু করল।

বৈকুণ্ঠ বলল, সকাল বেলা যখন জাল টানব তখন দেখবে কত মাছ, নৌকো বোঝাই হয়ে যাবে।

তা বাবু, আমি বললাম, তোমাদের নিয়ে জঙ্গলে আসাটাই আমার বেকুবি হয়ে গেছে। তোমরা বাঘ মারবে না ঘেঁচু।

বৈকুণ্ঠ বড় রসিক লোক, বলল ঘেঁচু মারাও কম কথা নয় গো সন্যা। ক'জন ঘেঁচু মারতে পারে বল ?

ধরে নিলাম। ফলে ও নিয়ে আর আমরা মাথা ঘামাই নি। আমরা বাবু আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে একটা খাঁড়ির মুখে নৌকো নোঙর করলাম। তখন চারপাশে অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে নেমে এসেছে। আর থোকায় থোকায় জোনাকি জ্বলতে শুরু করেছে।

একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ছইয়ের পাশে রাখলাম। ঠিক হল, গল্প সল্প করে রাতটা কাটিয়ে দেব। কাল ভোর হলে একজন মাত্র নৌকোয় থাকবে, আমরা বাকি সবাই জঙ্গলে ঢুকব। দরকার হয় আমরা গাছাল দিয়ে অপেক্ষা করব। 'কু' দেব। বাঘ যদি ধারে কাছে থাকে আমাদের 'কু' শুনে নির্ঘাৎ এগিয়ে আসবে। তখন গুলি করব।

—'কু' কি ?

সনাতনবাবু বললেন, 'কু' হচ্ছে নানারকম জন্তু জানোয়ারের আওয়াজ। সুন্দরবনের শিকারীরা অনেকেই 'কু' দিতে পারে। যেমন ধরুণ বানরের ডাক, ছাগলের ডাক, গরুর ডাক। শিকারীরা গাছে বসে 'কু' দিয়ে অনেক সময় বাঘকে লোভ দেখায়। বাঘ এগিয়ে এলে গুলি করে।

হ্যাঁ বাবু তাই। সন্যাও সায় দিল। তারপর আবার শুরু করল, আমরা ভূতের মতো পাঁচটা লোক নৌকোয় বসে রইলাম। এমন সময় হঠাৎ বৈকুণ্ঠ বলল, খাঁড়ির মুখে বেড় জালটাকে পেতে রাখলে কিন্তু প্রচুর মাছ পাওয়া যেত হে। বিরাট বড় বড় দু' তিনটে মাছের ঝাঁক পার হয়ে গেল।

ওর কথা শুনে আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল, কিন্তু তখন আর উপায় কি। কথা না বলে বসে বসে বন্দুকটা হাতে নিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। বৈকুণ্ঠ তামাক ধরাল। গুড়ুক গুড়ুক করে শব্দ হতে লাগল। বাকিরা হাত পা নেড়ে মাঝে মাঝে মশা তাড়াতে শুরু করল।

অনেকক্ষণ ঐভাবে কেটে গেল। আমার চোখ সারাক্ষণ জঙ্গলের দিকেই রয়েছে। বলা যায় না, কখন মূর্তিমান বাঘের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অবশ্য এ অন্ধকারে বাঘের চেহারা কতদূরে দেখা যাবে কে জানে ! জঙ্গলের গাছগাছালিই এখন আলাদা করে চেনার উপায় নেই। তবু তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি।

আমি বাবু তাকিয়েই রইলাম।

হঠাৎ দেখি এক জোড়া জ্বলজ্বলে আলো জ্বলছে। কেমন যেন স্থির হয়ে আছে আলোটা। জোনাকি নয়, জোনাকির তো ক্ষুদে ক্ষুদে আলো, জ্বলছে আর নিভছে। কিসের আলো তা হলে!

আমি ফিসফিস করে বৈকুণ্ঠকে ডাকলাম, ও বৈকুণ্ঠদা ঐ দেখ, দেখেছ?

বৈকুণ্ঠ হুঁকো নামিয়ে তাকাল, কি?

ঐ যে আলো দুটো ঝোপের গায় গায়। কিসের আলো গো?

খানিকক্ষণ পর আমারই ঘোর কাটল। ও রকম আলো তো আমি আগেও দেখেছি। আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি ফিসফিস করে বললাম, সাবধান, বাঘ মনে হচ্ছে গো। বাঘের চোখ।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সবাই কেমন ঘাবড়ে গেল। এসময় সবার উচিত বুকে সাহস বেঁধে তৈরি থাকা। তা না, ভয়ে সব যেন মূর্চ্ছা যায়। এদের সঙ্গে শিকারে এসে যে কি ঝকমারি করেছি তখন হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছি। ভীষণ রাগ হচ্ছিল লোকগুলির উপর, কিন্তু তখন আর কিছুই করার ছিল না।

আলো দুটো এবার একটু একটু দুলে উঠতেই আমি বনবিবির নামে একবার গুলি ছুঁড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জঙ্গলটা বাবু ভীষণভাবে যেন ককিয়ে চিৎকার করে উঠল। আলো দুটোও টুপ করে কোথায় হারিয়ে গেল।

কি যে হল বুঝতে একটু সময় লাগল। হঠাৎ সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে বাঘটাও হুংকার ছাড়ল। বাপরে সে কী গর্জন।

আর যায় কোথায়, নৌকোর মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল! কোন রকমে ওদের আমি শান্ত করলাম।

বৈকুণ্ঠ বলল ঐ আলো দুটো তা হলে বাঘেরই চোখের! রাত্রি বেলা বাঘের চোখ ওরকম করে জ্বলে জানতাম না তো?

সনাতনবাবু বললেন, বাঘের চোখ কেন, সমস্ত জানোয়ারের চোখই রাত্রি বেলা ওরকম জ্বলে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন দুটো গোল গোল আলোর গোলা অন্ধকারে ভাসছে।

সন্যা বলল, হ্যাঁ বাবু, ঐ আলো দেখেই বুঝতে হয় কোনটা বাঘ কোনটা হরিণ। রাত্রি বেলা গরুর চোখের দিকে তাকালেও ওরকম আলো দেখবেন।

—ঠিক আছে তারপর কি হল বল?

সন্যা বলল, আমি ওদের কান্ডকারখানা দেখে ঠিক করলাম, আর নয়, সকাল হলেই আবার ফিরে যাব। ভিতু লোকদের নিয়ে জঙ্গলে ঢোকায় ঝামেলা অনেক। ও সব ঝামেলায় বাবু কে যায়।

এমন সময় ভলগু এসে খবর দিল, বাবু সায়েব খানা রেডি হয়ে গেছে।

—দাঁড়াও হে। গল্পটা বেশ জমে এসেছে। শুনে নেই আগে, পরে খাব। হ্যাঁ তুমি বলে যাও সন্যা।

সন্যা আবার শুরু করল, আমি মনে মনে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলেও ওদের কিছু বললাম না। বরং আপাতত রাতটা যেন কেউ ঘুমিয়ে না পড়ে তাই নানা রকম গল্প জুড়ে দিলাম। আর সারাক্ষণ জঙ্গলের দিকে নজর রাখতে শুরু করলাম। সবাইকে বলে দিলাম ওরকম আলো যদি কেউ দেখে সঙ্গে সঙ্গে যেন সাবধান হয়।

গল্প করতে করতে মাঝ রাত হয়ে গেল। কিন্তু বাঘের কোন সাড়াশব্দই আর পাওয়া গেল না! না কোন আলোও। ভাবলাম বাঘটা বুঝি রাতে আর জ্বালাতে আসবে না!

শেষ পর্যন্ত বাবু ভোরের দিকে একটা কান্ড ঘটল। আমাদের পাঁচ জনেরই বুঝি একটু ঘুম ঘুম এসেছিল, হঠাৎ নদীর জলে খুব কাছেই একটা ঝটাপটির শব্দ। সবাই চমকে উঠলাম।

বৈকুণ্ঠ বলল, এই সেরেছে, বেড় জালে বুঝি কুমির আটকেছে।

কুমির! তাই তো এই জলে যে কুমির আছে সে কথা তো একবারও মাথায় আসে নি। আমরা কেবল বাঘের জন্যই হাঁ পিত্তেশ করে বসে আছি। আর জাল পাতা হয়েছিল মাছের জন্য, মাছের বদলে কুমির! কি হবে তা হলে! কুমির যদি হয়, জালটাকে তো ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেলবে।

বৈকুণ্ঠ জেলে জালের রশি হাতে তুলে নিয়ে টান বোঝার চেষ্টা করল। অন্ধকারে ভাল করে কিছুই নজরে পড়ার উপায় নেই। অথচ চোখের সামনে জালের কাছাকাছি বেশ তোলপাড় হচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি। জলের ওপর কি যেন একটা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে! কি রে বাবা! সত্যি সত্যি কুমির! কুমির না হয়ে কামটও হতে পারে। বিশাল আকারের কোন মাছও হতে পারে।

ঘণ্টা খানেক ধরে জাল টানাটানি চলল আমাদের। জাল ধরে রাখাই দায়। তা বাবু পাঁচজন মিলে খুব কসরৎ করলাম। শেষটায় ভোর হয়ে আসতে লাগল। পাখির ডাকে সারা জঙ্গল জেগে উঠতে শুরু করল, একটু একটু করে আলোও ফুটতে লাগল।

বৈকুণ্ঠ বলল, আর নয় এবার জালটাকে গোটান যাক। এসো দেখি, পারে নেমে জালটাকে গ্নটিয়ে তুলি।

বৈকুণ্ঠ জেলে জাল টানার হিসেব জানে। ওর কথা মতো আমরা এক এক করে পাড়ে নামলাম। তারপর ধীরে ধীরে জাল টেনে গোটাতে শ্নর্ন করলাম। বোধ হয় আধ ঘণ্টা জাল টেনেছিলাম আমরা। জাল যখন গ্নটিয়ে বেড় খ্নব ছোট হয়ে এসেছে, তখন আমাদের চক্ষ্ন স্থির। কুমির কোথায়! এ যে বাঘ। জালে জড়িয়ে গিয়ে বাঘ বাবাজী কুপোকাৎ হয়ে পড়ছে।

সন্যা বলল, আমিও পারি না বাব্ন কিন্তু ঐ জেলেদের সংগে গিয়ে ও রকম ব্যাপার হয়েছিল সেবার। বাঘটাকে মেরে কি যে আনন্দ হয়েছিল কি বলব! মরা বাঘটাকে আমরা টেনে টন্নে নৌকোয় তুললাম। তারপর হৈ হৈ করে ফিরে এলাম!

কিন্তু আমার তখনো একটা সন্দেহ থেকেই গিয়েছিল। শ্নধালাম, বাঘটা জলে নামল কেন? বাঘ তো জলের জীব না, তাহলে?

সনাতনবাব্ন বললেন, এটা ব্নঝলেন না। বাঘটা

আমাদের তখন পায় কে বাব্ন। বাঘ তখন আমাদের ম্নঠোয়। আর একট্ন টেনে নিয়ে জালবন্দী বাঘটাকে একেবারে পারের কাছাকাছি এনে শ্নর্ন হল আমাদের লাঠি পেটা। দমাদ্দম পিটিয়ে পিটিয়ে বাবাজীবনকে আমরা স্বর্গে পাঠিয়ে দিলাম।

সন্যা বাওয়ালী এবার থামল। চোখদ্নটো ওর চক চক করছে। গামছাটা টেনে নিয়ে আবার ম্নছল!

—এতো ভারী মজার ব্যাপার। জীবনে অনেক বাঘ মারার গল্প শ্ননেছি কিন্তু জালে বাঘ ধরা, ভাবতেই পারি না।

ভেবেছিল নদী সাঁতরে নৌকোয় উঠবে। উঠে ওর ভুঁরি ভোজের জন্য কাউকে না কাউকে তুলে নিয়ে জঙ্গলে পালাবে। ও বেচারীর সে গ্নড়ে বালি পড়ল।

সন্যাও সমর্থন করল, হ্যাঁ বাব্ন, জাল পাতা না থাকলে আমাদের সেদিন কারো না কারো জীবন যেত। বড্ড জোর বেঁচে গেছি বাব্ন।

সনাতনবাব্ন বললেন, তোরা বাঘ মারার জন্য কেমন প্নরস্কার পেয়েছিলি বল?

সন্যা বলল, হ্যাঁ বাব্ন, পাঁচশ' টাকা আমরা পাঁচজনে সমান করে ভাগ করে নিয়েছিলাম।

চলো আমার সঙ্গে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

লোবো সায়েবের পুরো নাম সোনি লোবো। ইংরিজি কাগজে নাম বেরোয় তার ফি-দিন। কলকাতার খুব নামজাদা একটা হোটেলের ব্যাণ্ডমাষ্টার। সেই হোটেলের খুব বড়ো আর আলো ঝলমলে একটা ঘরে নাম-না-জানা কতো বাদ্যি-বাজনা। লোবো আঙ্কল কাঠি তুলে বাজাতে বললে তবেই একসাথে বাজে। সে কি জগঝম্প আওয়াজ রে বাবা! এরই নাম নাকি গান? মাথায় থাক অমন গান। গানের মুখে ঝাঁটার বাড়ি।

সেই লোবো আঙ্কলের সঙ্গে কেমন করে আমার আলাপ জমলো, সেই কথাটা আগে বলি। সেবার আমরা গেলুম গোপালপুর। গোপালপুর-অন-সী। সমুদ্রতীরের শহর। এককালে শুনেছি সায়েবরা যেতো ছুটি ছাটায়। এখন আর সায়েব সুবো কোথায়, যে যাবে। এখন ঐ যাকে বলে বাঙালি সায়েব, তারাই যায়। আমরা কিন্তু বাপু ঐ সায়েব কেলাসের না। সাধারণ বাঙালি। বাবা মা তাই আমাকে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠায়নি! তা সে যাই হোক। বলছিলুম যা, বলি। মা আমার নাম দিয়েছেন বক্তিয়ার খিলজী। একটু বেশি কথা কই কিনা, তাই জন্যে।

গোপালপুর বেশ অনেকটা দূর। এই দিনের বেলা চড়লুম। রাত কাবার হয়ে ভোরে গেলুম ইষ্টিশন। ইষ্টিশনের নাম আবার বেরহামপুর। বেরহামপুর-গঞ্জাম। আমাদের তো আবার একটা ঐ ধরণের জায়গা আছে—বহরমপুর মুর্শিদাবাদের কাছে। তাই বুঝি ওর নাম বেরহামপুর গঞ্জাম রাখা? আসলে, ইংরিজি বানানে দুটোই এক।

লোবো আঙ্কলদের হোটেলের আর একটা হোটেল ঐ গোপালপুরেই। সেটা দেখতে শুনতে বুঝি একবার গিয়েছিলো। তা সে বহুবছর আগের আদ্দিকালের কথা হবে। ওখানে গিয়ে জায়গাটা ওর চোখে লেগে গেলো। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে, হ্যাঁ একটা বাড়িও পাওয়া গেলো। আর যাঁহাতক না পাওয়া, লোবো আঙ্কল ফস করে পকেট থেকে চেকবইটা বের করে সই। কিছু টাকা দিলাম, বাকিটা পরের সপ্তায় এসে দেবো। আঙ্কলের বাড়ি কেনার সেই হলো ঘটনা। নিজের কানে শোনা। বাদাম গাছের তলায় আরামের চেয়ারে শুয়ে শুয়ে আঙ্কল আমাকে এমনি ভাবে কতো যে গল্প শুনিয়েছে তার কোনো গোণাগুণতি নেই। তাও, সে কথায় পরে আসছি। তার আগে কীভাবে এলুম, সেকথা বলি।

ইষ্টিশনটা বেশ বড়ো। এমুড়ো ওমুড়ো দেখা যায় না। ঝকঝকে তকতকে প্লাটফরম। ইষ্টিশনের যেদিকটায় আমরা যাবো না, সেদিকটার নাম শুনলুম গনজাম। আর যেদিকে যাবো, সেদিকে শহর বাজার কিছু নেই। বার কিলোমিটার যেতে পারলেই সমুদ্র। আমরা গুটি গুটি ইষ্টিশন থেকে বাইরে। সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা হবে! রোদ চড়চড় করছে। হাওয়া আছে বলেই কিছুটা রক্ষে। নইলে, বাবার টাক ফুটি ফাটা হতো নির্ঘাৎ এই টাককে বাবা কিনা বলেন, টকাশ। টাক আর কপাল মিলিয়ে 'পোর্টম্যানটো' শব্দ। সে আবার কিরে বাবা? শুনলুম, বড়ো হলে বুঝবো। পৃথিবীর তাবৎ বোঝাবুঝি বড়ো হবার অপেক্ষায় যেন বসে আছে। থাকুক। সঙ্গে মোটঘাট ছিলো। বাসের জন্যে না দাঁড়িয়ে বাবা এগিয়ে গেলেনও একটা গাড়ির দিকে। ওটাই নাকি ট্যাক্সি! এ আবার কী ট্যাক্সি? কলকাতার মতন হলুদ-কালো দু রঙা তো না! ঝপাঝপ উঠে পড়া। গাড়ির মাথায় আবার বাচ্চাদের জন্যে চৌকোণো বারান্দা মতন একটা জায়গা। সুটকেশ বিছানা সব সেখানে এঁটে গেলো। পেছনের গর্ত খোলার দরকারই হলো না। আমরা তো মোটে আড়াইজন। তা তার ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। গাড়ির পাশে মুখ চুন করে দাঁড়িয়েছিলো আরো দুটি ছেলেমেয়ে। ওমা, ওর যে দেখি আবার মাথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা! কেমন নতুন বৌ নতুন বৌ মতন দেখতে। ওরাও কি আমরা যেখানে যাচ্ছি, যাবে? বেশ মজা হয় তাহলে। একটা কথা বলার লোক জোটে।

বাবা নাকি মনের কথা পড়তে পারে? আহঃ, তাই তো দেখছি। মুখ বাড়িয়ে বললেন, আপনারা কি গোপালপুর যাবেন?

ওরা দুজনেই কলের পুতুলের মতন ঘাড়-নাড়ালো।

কীসে যাবেন?

কেন? কিছু পাওয়া যাবে না? এই ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি?

তখুনি ট্যাক্সিওয়ালাই বাংলায় উত্তর দিলো, আর ট্যাক্সি পাবেন না। আমায় লোবো সায়েব এঁদের নিতে পাঠিয়েছেন। তবে বাস আছে। বাস পেতে পারেন। একটু ভিড় হবে।

বাবা ইঙ্গিতে ট্যাক্সিতেই উঠে পড়তে বললেন। ওদের মুখে কিন্তু কিন্তু ভাব। আমার যা মজা লাগছিলো না। আমি বাবার দিকে অনেকটা সরে নতুন বৌকে জায়গা করে

দিলুম। জানালার ধার তোমায় ছেড়ে দিলুম গো নতুন বৌ। আমার সঙ্গে ভাব করবে তো?

উঠেই আমার গালটা টিপে একটু নিচু গলায়, নতুন বৌকে যেমন মানায়,, শুধুলো, কি নাম তোমার?

গাল টেপাটা একটু বাড়াবাড়ি। তাও নাম বলতেই হয়!

তুমি আমার বন্ধু হবে তো? কত্তো কড়ি ঝিনুক তোমায় কুড়িয়ে দেবো। হবে তো? মাথা নাড়লুম। পীচ পথ ধ'রে দৌড়। দুপাশে ঘরবাড়ি ক্রমশ কমে আসছে। তার বদলে পড়ছে টিলা আর ফণিমনসার ঝোপ, কণ্টিকারী আর কালো ছোট বড় পাথর। হাওয়া বাড়ছে। কেমন ধারা হাওয়া-বাতাস যেন এটা। কলকাতায় এর নাম গন্ধ নেই। বাতাসের আগলপাগল গন্ধ আছে। জিব বের করে ঠোঁট চাটলেই নুন। আলুনি তরকারি তিতি একদম খেতে পারে না। ভাতের পাতে একদলা কাঁচা নুন ওর সর্বদা দরকার।

বাঁকের মুখে এসে থমকে দাঁড়ালো গাড়িটা। সামনেই বাঁ হাতি পরিদর্শন বাংলো। ডানদিকে টিলার মাথায় চড়ে হাসপাতাল, তার সুন্দর বাড়ি আর ফুলবাগান। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় তিতির। এতক্ষণের হাহাকার ভরা মাঠ ময়দান বুঝি শেষ হলো। এখানে এমন একটি প্রাসাদ কে বানালো রাতারাতি? স্বপ্ন নয় তো? তিতি এমন জেগে জেগে স্বপ্ন দ্যাখে।

তারপরই কিছু বড়ো বড়ো গাছপালা, ছোট ছোট বাড়ি ঘর। হাটবাজার। টং-এ চড়া দোকান! পোণ্টাপিস। এদিক ওদিক অলিগলি। বালি শুরু হয়ে গেছে। গলির ওপর থেকে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে সমুদ্র, তা কি সাদা? নাকি বালির সমুদ্র?

গাড়ি গিয়ে সমুদ্রের মুখোমুখি, সমুদ্রের দিকে নামতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো। লোবো আঙ্কলের বাড়ি বলো, বাংলো বলো—এটা হলো তাই। আমরা একে একে নামলুম। বাঁদিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরে না। কতক্ষণ তাকিয়ে ছিলুম মনে নেই। বাবা তাগাদা দিলেন, এখন ভেতরে চলো। সমুদ্র তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

পালাতে পারে—এমন ভয় মনের মধ্যে চেপে রেখে গুটি গুটি ভিতরের দিকে। উঠোন কি নরম! বাদামের রাঙা পাতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সামনে সেই স্বপ্নপুরী—যার ভিতরে-বাইরে জড়িয়ে থেকে আমি সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকবো। নীলে কোনো ব্যথা নেই।

নতুন বর-বউ আমাদের সঙ্গে। ওরা আগে থেকে কিছু ব্যবস্থা করে আসেনি। আঙ্কল লোবো আমাদেরসঙ্গে ওদেরো রেখে দিলেন। আমার যে কী ভালো লাগছিলো কী বলবো? একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে নতুন বউ। তার গায়ে কেমনধারা গন্ধ!

[চলবে

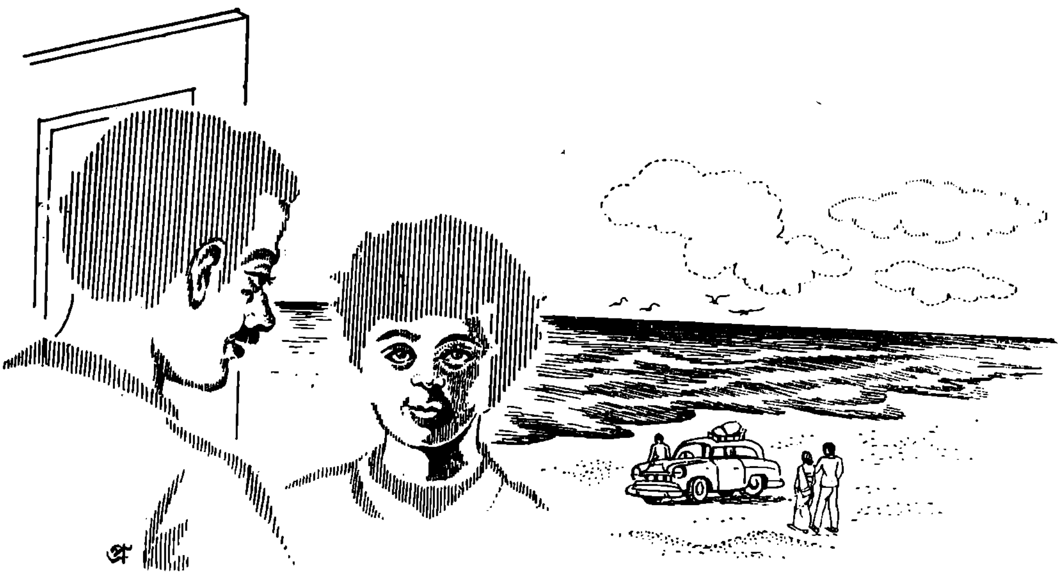

ছবি দেখে গল্প বলো—প্রতিযোগিতা—আষাঢ়-এর ফলাফল

'ছবি দেখে গল্প বলো' এই প্রতিযোগিতায় তোমরা যে এমনভাবে সাড়া দেবে, আগে বুঝতে পারি নি। যে লেখাই পড়তে যাই, সেটাই দেখি চমৎকার। কাকে ছেড়ে কাকে পুরস্কার দেবো, ভাবতে গিয়ে হিমসিম। এর মধ্যে থেকে তিনজনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। অন্য সব লেখার মধ্যে দুটো ত্রুটি চোখে পড়েছে আমাদের। এক, অনেকেই একটি বিশেষ গ্রন্থাবলী থেকে টুকে দিয়েছ, আর বাকীদের লেখাটা নিজের না হয়ে অভিভাবকের লেখা। আমি বলবো, ভাল-মন্দ যেমনই হোক, নিজেদের বুদ্ধি এবং কলম দিয়ে লেখাটাই সবচেয়ে ভালো।

প্রথম হয়ে উষারাণী করাতি স্মৃতি পুরস্কার পাবে **লালি শীল**, চুঁচুড়া, হুগলী

দ্বিতীয় হয়ে মনোহর করাতি প্রদত্ত উৎসাহ পুরস্কার পাবে **সৌমিত্র দত্ত**, বিধিচন্দ্রপুর, হাওড়া

তৃতীয় হয়ে পক্ষিরাজ পত্রিকা প্রদত্ত সান্ত্বনা পুরস্কার পাবে **দেবব্রত পাল**, বদরতলা, ২৪ পরগণা

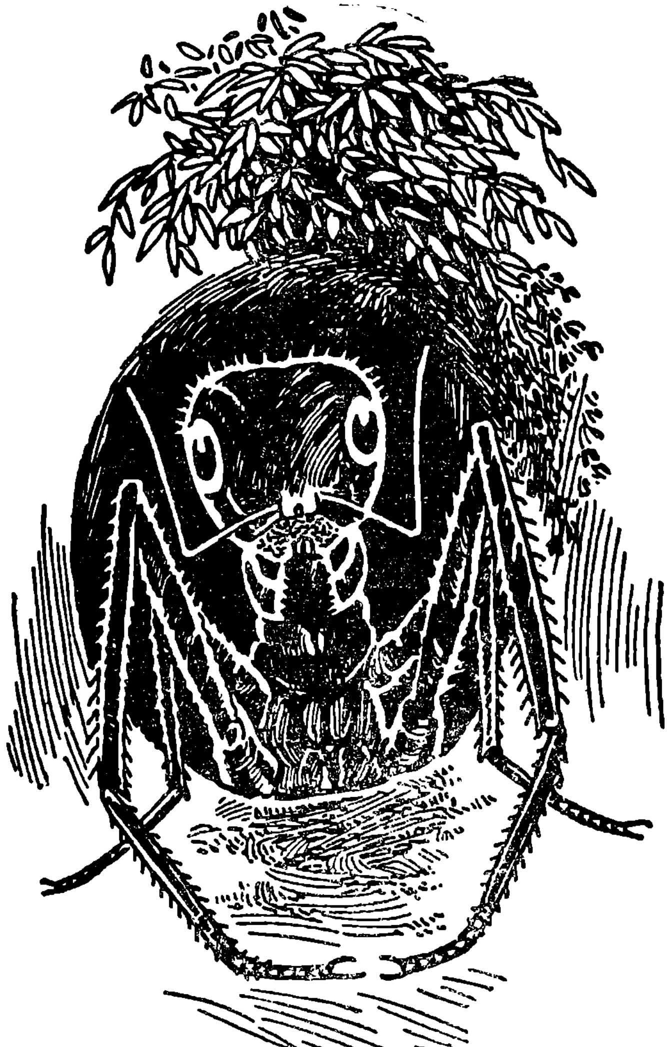

ছবি দেখে গল্প লেখো

ভাদ্র মাসের প্রতিযোগিতা

পরিচালনা : **পূর্ণেন্দু পত্রী**

তোমাদের চোখের সামনে রাক্ষসের মত মুখ করে তাকিয়ে আছে কে বলতো ? একটা পিঁপড়ে। চাকরীটা হল জল্লাদের। শুনে অবাক হচ্ছো ? অবাক হবার কিছু নেই। এটা একটা বইয়ের চরিত্র। এমন বই যার প্রধান চরিত্রের সবাই পিঁপড়ে। অন্যান্য চরিত্রগুলো হলো গিরগিটি, উঁচংড়ে, ব্যাঙ, সাপ, ছ্যাতরা পাখি, কাঁকড়া বিছে এরা সব। বলতো কী সে বইয়ের নাম ? লেখক কে ? আর উপরে যে ছবিটা দেখছো সেটা গল্পের কোন্ সময়ের ছবি ?

নিয়মাবলী ৪০ পৃষ্ঠায় দেখে নাও

বিশু ডাকাতের রণ-পা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই রণ-পায়ালা ডাকাতদের আজকাল আর দেখা যায় না। আমাদের ছেলেবেলায় অন্তত একজন ডাকাত ছিল—যাকে গাঁয়ে গঞ্জের লোকেরা বলত বিশু ডাকাত, যে রণ পায়ে ভর দিয়ে হিল্লি দিল্লি চলে যেতে পারত। তিনদিনের রাস্তা তিন ঘন্টায়। তার রণ-পা জোড়া কত লম্বা ছিল তা-হলে, এই নিয়ে একদিন ছোট কাকা আর মেজ মামার মধ্যে তর্ক লেগে গেল। মেজ মামা বললেন, আরে ও কি রেল গাড়ি নাকি যে তিন দিনের রাস্তা তিন ঘন্টায় যাবে। ছোট কাকা বললেন, রেল গাড়ি না হোক গরুর গাড়ি তো নয়—তুমি যেমন একটা ঢোল! আমার মেজ-মামা অবশ্য একটু বেশিই গোলগাল মানুষ, ছোট্ট কাকা ফাঁক পেলেই বিয়াই মশাইকে ঢোল মশাই বলতেন।

সে যা-হোক তিনদিনের রাস্তা তিন ঘন্টা, সে কেমন ব্যাপার, দেখা যাক বলে আমরা রণ-পা বানিয়ে ফেললাম। এবং রণ-পায়ে হাঁটা অভ্যাস শুরু হয়ে গেল। অবশ্য আমাদের দেখে গাঁয়ের সব ছেলেই রণ-পা বানিয়ে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল। বিশু ডাকাতের রণ-পা ছিল কিংবদন্তীর মত। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রণ-পা ছিল হাকলু পালের। সে বাঁশ খুঁজে খুঁজে নিয়ে এল, সরু লম্বা, চিকণ মিহি, এবং তেলতেলে বাঁশ, ওর মতো বাঁশের সমঝদার কমই আছে। ছোট কাকা ওর রণ-পায়ের বাঁশ আনতে বলল, হাকলু পালকে। এবং আমরা সবাই মিলে একদিন রণ-পায়ে পুরি পুজোর মেলায় চলে গেলাম—সে এক দৃশ্য। সারি সারি বিশ বাইশ জন আমরা। সবাই রণ-পায়ে চলতে পটু। অবশ্য আমার পটুত্ব কম ছিল বলে মাঝে মাঝেই পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে বাঁশের গিট ফসকে যেত। এবং রাস্তায় যা কিছু ঝামেলা আমাকে নিয়েই—ছোট কাকা ইজ্জত ঢিলে হয়ে যাচ্ছে বলে একবার কানও মলে দিল। মেজ-মামা এত গোলগাল অথচ একবারও পড়ে নি, বার বারই ছোট কাকা উদাহরণ হিসেবে মেজ-মামার কথা বলতে থাকল। আর কি করা, গাঁয়ের সবাই এগিয়ে যাচ্ছে, আমি পেছনে পড়ে থাকছি। ছোট কাকা বললেন, লিস্টি থেকে তোমার নাম বাদ গেল। তুমি নরেন দাসের সঙ্গে হেঁটে যাও। তারপরই মেজ-মামা এগিয়ে এলেন। বললেন, আমারটা তুই নে। পা ফসকাবে না।

মেজ-মামা ভারি মানুষ, পা রাখার কাঠ ভীষণ পালিশ করা, ফলে পা ভাঙবে, কিন্তু ফসকাবে না। বুঝতে পারলাম, সবচেয়ে সরেস এই রণ-পা। আর হাল্কা বলে বেশ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সবাইকে ধরতেই—হা হা করে উঠল সবাই। বলল, কিরে তোর কি বিশু ডাকাতের রণ-পা, কোথায় ছিলি আর কোথায় চলে এলি!

আমাদের এই রণ-পা নিয়ে হাঁটাহাঁটি দেখে গাঁয়ের যত মানুষ সব মাঠে নেমে এসেছিল। ছেলে বৌ সব। বালক বালিকারা পিছনে ছুটে আসছিল। ছোট কাকা সবাইকে নিয়ে রণ-পায়ে কতদূর যাওয়া যায় পরখ করার জন্য বুকে ব্যাজ লাগিয়ে দিয়েছিল একটা করে। অমর-পল্লী রণ-পা ক্লাব—ব্যাজে নাম লেখা। নীল ভেলভেট কাপড়ের ওপর সোনালী সুতোয় লেখা। অবশ্য মোট তিন মাইল রাস্তা যেতে আমাদের তিন ঘন্টার ওপর সময় লেগেছিল। এক নাগাড়ে তিন'শ গজ গেলেই পায়ের গিট শক্ত হতে থাকে। তখন নেমে বিশ্রাম। দশ মিনিট রণ-পায়ে হাঁটলে আধ-ঘন্টা বিশ্রামের দরকার হয়। সুতরাং রাতে বাড়ি ফিরে ছোট কাকা সভা ডাকলেন, সেখানে ক্লাবের সবাই হাজির।

সবাই প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল। ছোট কাকা সেক্রেটারি, তার খোঁড়ালে চলে না, কোনরকমে মাঠের ঘাসে বসে বললেন, তোমরা কি বুঝলে! তখন মেজ-মামা ভীষণ চিৎকার করে উঠল, পা গেল পা গেল। এবং আমরা তখন পায়ে উঁচু হয়ে দেখছি, সত্যি মেজ-মামার পা দুটো গেছে। গোড়ালি আর হাঁটু ফুলে সোজা সমান্তরাল হয়ে গেছে।

ছোট কাকা বললেন, এই কাকলু তোর মেজ-মামাকে ধরে বাড়ি দিয়ে আয়।

মেজ-মামা বললেন, সভার সিদ্ধান্ত না জেনে যাচ্ছি না।

ছোট কাকা বললেন, রণ-পায়ে তিন দিনের রাস্তা তিন ঘন্টায় যাওয়া যায় কিনা প্রথম বারে আনসাকসেসফুল।

হাকলু পাল বলল, ইয়েস আনসাকসেসফুল।

মেজ-মামা শুয়ে থেকেই বললেন, দমলে চলবে না।

ছোট কাকা বললেন, বিয়াই মশাই পরের এক্স্-পেডিসানে তোমাকে নেওয়া যাবে না। সব সিলেকটেড্ ক্যানডিডেট নেওয়া হবে।

মেজ-মামা বললেন, তা হলে কিন্তু আমি বিশ্বাস করব না।

এখানে পরম সংকট ছোট কাকার। সব ব্যাপারে মেজ-মামাকে কুপোকাৎ করতে না পারলে ছোট কাকার নাওয়া খাওয়া হয় না, চোখে ঘুম থাকে না। সব তো এই একজন বিয়াই মশাইর জন্য। কি যে ভুল করে ফেলেছে রণ-পায়ে তিন দিনের পথ তিন ঘন্টায় যাওয়া যায় বলে। বড়ই সমেস্যা। ছোট কাকা বললেন, কিন্তু পা তো ফুলে ঢোল হলো আমরা কিছু জানি না।

মেজ মামা বললেন, প্র্যাকটিস আরও করা দরকার। তখন আর পা ফা ফুলবে না।

সুতরাং আমাদের আবার পুরো দমে অনুশীলন। স্কুল থেকে এসেই ছোট কাকা বই পত্র বৈঠকখানা ঘরে রেখে হাঁক পাড়তেন, বড় বৌ খাবার চাই। জেঠীমা বলতেন, হাত মুখ ধুয়ে এস। আমাদের নিয়ে কাকা তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুতে যেতেন ঘাটে। তারপর সবাই মিলে খাওয়া। মেজ মামা খেতে খেতেই একজন বলল, বিশ্বাস পাড়ায় কবে যেন মেলা বসছে?

ছোট কাকা হিসেব করে বলল, মাঘি পূর্ণিমাতে।

—তা হলে ওটা আমাদের সেকেন্ড একসপেডিসানে জুড়ে দিলে হয়।

বিশ্বাস-পাড়া আমাদের থেকে সাত মাইল। রণ-পায়ে সাত মাইল যেতে হবে শুনে বেশ লাফিয়ে উঠতেই ছোট কাকা বলল, তুই এবারে নেই গোলি। বিশু ডাকাত ওদিকটাতেই থাকে।

মেজ মামা বললেন, তাহলে আমারও যেয়ে কাজ নেই বিয়াই মশাই।

ছোট কাকা বলল, সে কী করে হয়। তারপর ছোটকাকা আমাদের বার বাড়ির উঠানে রণ-পায়ে চেপে হাঁটতে থাকল এবং সঙ্গে হাকলু, ককুরো দা আর আমরা। মেজ মামার হাঁটুতে ব্যথা বলে বৈঠকখানা থেকে একটা চেয়ার বের করে এনে গম্ভীর মুখে বসে থাকল। রণ পায়ে ভর করেই ছোট কাকা তার বিয়াই মশাই-এর কাছে এসে চিৎকার করে উঠল, কোথায় ব্যথা।

—এই হাঁটুতে।

ছোট কাকা রণ পা থেকেই উঁচু হয়ে দেখল জায়গাটা, তারপর বলল, বিশু ডাকাতের শ্যালক ম্যাজিক দেখাবে মেলায়, তুমি না গেলে পরে আফশোষ করবে।

মেজ মামা বলল, ওকি রণ-পায়ে চেপে আসবে।

—তা আসবে কেন? সে আসবে গরুর গাড়িতে। ছোট কাকা রণ-পায়ে এবার আবার কিছুটা ঘুরে এসে বলল, তাসের খেলা, পাখির খেলা, রুমালের খেলা, কাটা মাথার খেলা কত সব তার খেলা আছে। আগে জামাই বাবুর সঙ্গে ডাকাতি করত এখন ম্যাজিসিয়ান। কেউ বলে আসলে ম্যাজিক বিশু ডাকাতই দেখায়। নকল দাড়ি গোঁফ পরলে কে চিনতে পারবে বিয়াই মশাই!

মেজ মামা বলল, আমার দাদাকে খবরটা দেবে নাকি!

—কী খবর!

—এই যে বিশু নকল দাড়ি গোঁফ পরে খেলা দেখায়!

—যদি শেষে না হয়, তোমার দাদার মুণ্ডু ছিড়ে খাবে। জান না তো যাকে বলে বিশু ডাকাত। তোমার দাদার দারগাগিরী বের করে দেবে।

আমাদের বাড়িটায় কত লোক থাকে, কে আসে যায় আমরা তার খবর ঠিক রাখি না। দাদুর বয়স আশি—এখনও খড়ম পায়ে পাশের গাঁয়ে চলে যান বেড়াতে। শেষ বয়সের ছেলে ছোট কাকা। বাবা জ্যেঠারা এগারটি ভাই। পিসির সংখ্যা গোটা সাতেক। আমাদের বাড়িতে কে আসে কে থাকে তার সীমে সংখ্যা নেই। মেজ মামা এখানে পড়তে এসেছেন গেল সালে। আমার ন' কাকীর ছোট ভাই। বাবা জ্যাঠারা সবাই দূর দেশে থাকে বলে ছোট কাকার প্রতাপ খুব। চাকর বাকরেরা ছোট বাবু বলতে অজ্ঞান! মেজ-জ্যাঠা বাড়ি থাকেন—বড় মাছ ধরার বাতিক—তিনি এক্ষুনি হেঁটে গেলেন বার বাড়ির উঠোনের ওপর দিয়ে—গোটা দুই স্যাংগাত সঙ্গে। মেজ বাবুর ধরা মাছটাই বয়ে আনবে, চাও করবে, তামাক সেজে দেবে। যাবার সময় এতগুলি রণ পায়ের হাঁটা-

হাঁটি দেখে, একবার শুধু বললেন, পড়াশোনা তোমরা সবাই লাটে তুলেছ। শেষ পর্যন্ত সব কটাকে ডাকাতি করেই খেতে হবে।

আমাদের বাপ জ্যাঠারা যেমন এক গুষ্ঠি আমাদের ভাই বোনে মিলেও এক গুষ্ঠি। আমাদের রণ-পা ক্লাবে বাড়ির সদস্য সংখ্যাই চোদ্দ। আর আছে হাকলু পাল। হাকলু পাল সেজ-জ্যাঠামশাইকে বলল, আমরা মেলায় যাব সেজ কত্তা। তাই রণ-পা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছি। অবশ্য ছোট কাকা কথা বলারই লোক নন। হাকলু কথা বলছে বলে ক্ষেপে যাচ্ছে। অনুশীলনের সময় এ-সব কি আজে বাজে বিশ্রী কথোপকথন। শুধু ছোট কাকা বলল, কথা বলার সময় অনেক পাবে হাকলু! নিজের কাজটি মনোযোগ দিয়ে কর।

শীতের শেষাশেষি মেলা। মাঘের শেষ সপ্তাহে তৃতীয়ার চাঁদ দেখে আমাদের রওনা হতে হবে। মেলায় ঘোড় দৌড় দেখব, জিলিপি খাব, বিশু ডাকাতের শ্যালকের ম্যাজিক দেখব। আর মেলা বলে কথা। লোকজন, কাচের চুড়ি, বিন্নির খৈ, গুড়ের বাতাসা এ-সবতো আছেই। আমার অবশ্য অন্য একটা মজাও আছে। যদি বিশু ডাকাতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, ওর রণ-পা দুটো চেয়ে নেব। আমাদের কত্তাবাবার আমলে বিশু গোয়ালে কাজ করত।

নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যায় সবাই মিলে তৃতীয়ার চাঁদ দেখলাম। তারপর ছোট কাকা আমাদের নিয়ে পুকুরে নামলেন। যতক্ষণ আকাশে চাঁদ থাকল, সাঁতার কাটা গেল। তারপর গোয়াল-ঘরের পাশে পিক নিক হল আমাদের! বড় কই মাছ ভাজা আস্ত করে একটা, কই মাছ দিয়ে ফুলকপি, কচ্ছপের মাংস আর মুগের ডাল দিয়ে ভাত, শেষে সামান্য দই এবং মিষ্টি। খেতে খেতে রাত দশটা। শুয়ে পড়তে হবে সকাল সকাল, কারণ খুব সকালে রওনা হতে হবে।

আর যখন আমরা রওনা হলাম সে দেখার মতো কান্ড। আমাদের এক রকমের পোষাক। সাদা প্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা কেডস্ জুতা, সাদা মোজা। নীল রঙের অমর পল্লী ক্লাবের ব্যাজ বুকে। সবার হাতে এক জোড়া রণ-পা। ছোট কাকা দৌড়ে দৌড়ে লাইন সোজা করে বাঁশিতে ফু দিল। আমরা যে যার রণ-পায়ে হেঁটে যেতে থাকলাম। সবার পেছনে ছোটকাকা আর হাকলু পাল। বাড়ি থেকে বের হতে কোন গাছ টাছে লেগে যাত্রার যাতে বিঘ্ন না ঘটে সে জন্য ছোট কাকা যত গাছপালা ছিল তার সব নিচু ডাল কেটে দিয়েছে! আমরা সোজা সড়কে পড়তেই এক এলাহী কান্ড। বিশ বাইশ জনের রণ-পা ক্লাব প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দিয়ে মাঠ ভেঙ্গে চলে যেতে থাকল। গাঁয়ের কাক পাখিও বাদ গেল না—দৃশ্যটা দেখে তাজ্জব বোনে গেল।

এবারে সত্যি আমরা অনেক পটু। প্রায় মাইল দুই হেঁটে একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে বিশ্রামের বাঁশি বাজল। মেজ মামা শুধু বলল, বিয়াই মশাই সময় কিন্তু আধ ঘণ্টা লাগল। রেলগাড়ি আধ ঘণ্টায় দু মাইল গেলে কোম্পানী লাটে উঠবে। ছোট কাকা গুম মেরে থাকল। কথা বলল না। পাশে জলছত্র। একটি করে বাতাসা আর এক গ্লাস করে জল। জল খাওয়ার পর যারা বড় তাদের হাতে হাতে ছোট কাকা নস্যির ডিবে ঘুরিয়ে আনল! এবারে গরিপরদীর মঠ পর্যন্ত। ছোটকাকা বলল যাদের জল তেষ্টা পেয়েছে, তারা সবাই পেট ভরে জল খেয়ে নাও। গরিপরদী গিয়ে খাওয়ার কথা ভাবব।

আমার আবার খিদে পেলে খুব কষ্ট হয়! বললাম, এখানে কিছু খেয়ে নিলে হত না ছোট কাকা?

তার এক কথা। ছোট কাকা শুধু বলল, না।

গরিপরদী পেঁৗছে আমরা দুটো করে অমৃতি আর এক ধামা করে মুড়ি পেলাম। গরিপরদীর মদন সার সঙ্গে কাকার খুব ভাব। টাকা পয়সার কথা কিছু বলল না! রণ-পা ক্লাবের সদস্যদের দেখার জন্য গ্রাম ভেঙ্গে পড়েছে। কেউ কেউ নাড়ু, মোয়া, মুড়ি নিয়ে এসেছে। আমাদের হাকলু পাল একটা বড় ব্যাগে সব নাড়ু নিয়ে বলল, লাইন দাও। সবার হাতে দুটো করে দিয়ে বাকিটা ফেরত দিয়ে দিল হাকলু। বড়ই সৌজন্য পরায়ণ হাকলু—যারা আমাদের দেখতে এসেছে তাদের হাতে হাতেও দুটো করে দিয়ে সব নাড়ু মোয়া, তিলের তকতি শেষ করে দিল।

আর অবাক, একটা ব্যান্ড পার্টিও জুটে গেল। গরিপরদীর মদন সাই বলল, যখন যাচ্ছেন, একটু জাঁকজমক করে যান। বিশু ডাকাত যদি মেলায় গুপ্তচর পাঠিয়ে থাকে তবে বুঝতে পারবে অমর পল্লী ক্লাব বড়ই জাঁদরেল ক্লাব। আশে পাশের গাঁয়ে ডাকাতি করার আর হারামজাদার সাহস হবে না। বলেই চারপাশে তাকাল। কি জানি বলা যায় না তো বিশে কোথায় কাকে গুপ্তচর করে রেখে দিয়েছে কে জানে।

কিন্তু ব্যান্ড পার্টি যেই তালে তালে বাজতে শুরু করল আমাদের রণ পাও তালে তালে এগোতে থাকল। কিন্তু মুসকিল আমরা তিন-পা গেলে ব্যান্ড পার্টি এক পা এগোয়। অতদূর যেতে দিন কাবার হয়ে যাবে। তখন কথা হল ঠিক বাইশ জন ব্যান্ডের লোক যাবে। আমাদের

কোমরে ঝুলে থাকবে এক এক জন। প্রথমে আমিই বললাম, পড়ে যাই যদি। কিন্তু ছোট কাকার এক কথা—পারিব না একথাটি বলিও না আর। অগত্যা একটি সাত বছরের বালক এবং ছোট্ট ড্রাম সহ আমি কোমরে ঝুলিয়ে ডাবল সাইকলিং শুরু করতে গিয়েই চিৎপটাং। প্রায় সবারই এ-অবস্থা হওয়াতে ছোটকাকা বলল, ঠিক আছে ব্যান্ড পার্টি দৌড়াও। ছোটকাকার কথা মত ওরা যে যার পিঠে বাঁশি ব্যাগ পাইপ ড্রাম নিয়ে দৌড়ুতে থাকল! তারপর রয়ে সয়ে আমরা। মেলার কাছে যেতেই ধনধুমার ব্যান্ড। লোকজন ছুটে আসছে। মেলাটাই বুঝি ভেঙ্গে যাবে। আমরা মেলা দেখতে গেছি কে বলবে! যেন

মেলাটাই আমাদের দেখতে আসছে। ছোট কাকা বলল, বড়ই বিপদে পড়া গেল!

মেজ-মামা বলল, মেলায় ত আসা গেল—কিন্তু সাত মাইল আসতে শেষ পর্যন্ত সাত ঘন্টাই লেগে গেল।

ছোট কাকা বলল, আসলে আমাদের রণ-পা খুবই ছোট। বিশু ডাকাতের রণ-পা পাব কোথায়। ওতো শুনেছি গাছের মাথার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত মেলায় পেঁাছানো গেছে সেই ঢের। ফেরার সময় ঠিক হল হাকলু পাল নৌকায় ফিরে যাবে। রণ-পা সব নৌকায় তুলে দেওয়া হবে। অতদূরের রাস্তা আবার রণ-পায়ে গেলে কেউ আর আস্ত থাকবে না।

মেলায় ম্যাজিকের লোকটাকেই আমার মনে হয়েছিল বিশু ডাকাত। ভীষণ উঁচু লম্বা। আর যা খেলা দেখাল, তাতে করে লোকটাতো সব মানুষকেই হাপিজ করে দিতে পারে। মন্ত্র পড়ে দুটো মেয়েকে হাওয়ায় বসিয়ে রাখল। পকেট থেকে তার ফর ফর করে উড়ে গেল অজস্র সাদা কবুতর। কানের পাশে দিয়ে সোঁ করে বের হয়ে গেল একটা তীর। সেটা সে খপ করে ধরে ফেলল। দুটো জ্যান্ত লোককে মঞ্চে তুলে নিয়ে সবার সামনে অদৃশ্য করে দিল। হাকলু পাল সহসা ভিড়ের মধ্যে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, বলল, কি হবে কর্তা, আমার ঘড়ি কে ছিনতাই করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই—যারা হাত-ঘড়ি পরে এসেছিল—একটাও আর কারো হাতে নেই। তাঁবুর মধ্যে বিশুর অপদেবতা নেইত আবার। তখনই যাদুকর বলল, আপনারা হল্লা করবেন না দয়া করে। ঘড়ি চুরি গিয়ে থাকেত কি করা যাবে। তারপরই হাঁকল, হাকলু পাল, এই নাও তোমার ঘড়ি। সে তার পকেট থেকে প্রত্যেকের ঘড়ি বের করে দিল।

আমি বললাম, মেজ-মামা বাড়ি চল। গতিক ভাল না। কখন তোমাকেই প্যান্টে পুরে রণ-পায়ে বাতাসের সঙ্গে ভেসে চলে যাবে।

আর অমনি মেজ-মামার পেট ব্যথা। এই গেলাম সেই গেলাম করতে থাকল। রণ-পা ক্লাবের আর ম্যাজিক দেখা হল না। মেজ মামাকে ধরাধরি করে হাকলুর সঙ্গে নৌকায় তুলে দেওয়া গেল। হাকলু মেজ মামা আর গুষ্ঠিশুদ্ধ রণ-পা নৌকায় যাবে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকেই পা গুড় গুড় করতে থাকল। ফুলতে থাকল। ছোট কাকারও কেমন বিমর্ষভাব। হাকলুই পরামর্শটা দিল, কর্তা সবাই নৌকায় চলেন। পাল তুলে দেব, পালে হাওয়া লাগলে দিনের পথ বেলায় বেলায় পাড়ি দিতে পারব।

ছোট কাকা শেষ পর্যন্ত কী ভেবে রাজি হলেন। আসলে মাঠের অন্ধকার রাস্তা দিয়ে আমাদের সবারই যেতে ভয় লাগছিল। কোথা থেকে বিশু ডাকাত আক্রমণ করবে কে জানে। তবে রক্ষে রণ-পা নিয়ে নদী নালা পার হওয়া যায় না। কাদায় গেঁথে যায়। বিশু ডাকাতের কি সাধ্য আমাদের নৌকার নাগাল পায়।

পিকলু

পরিচয় গুপ্ত

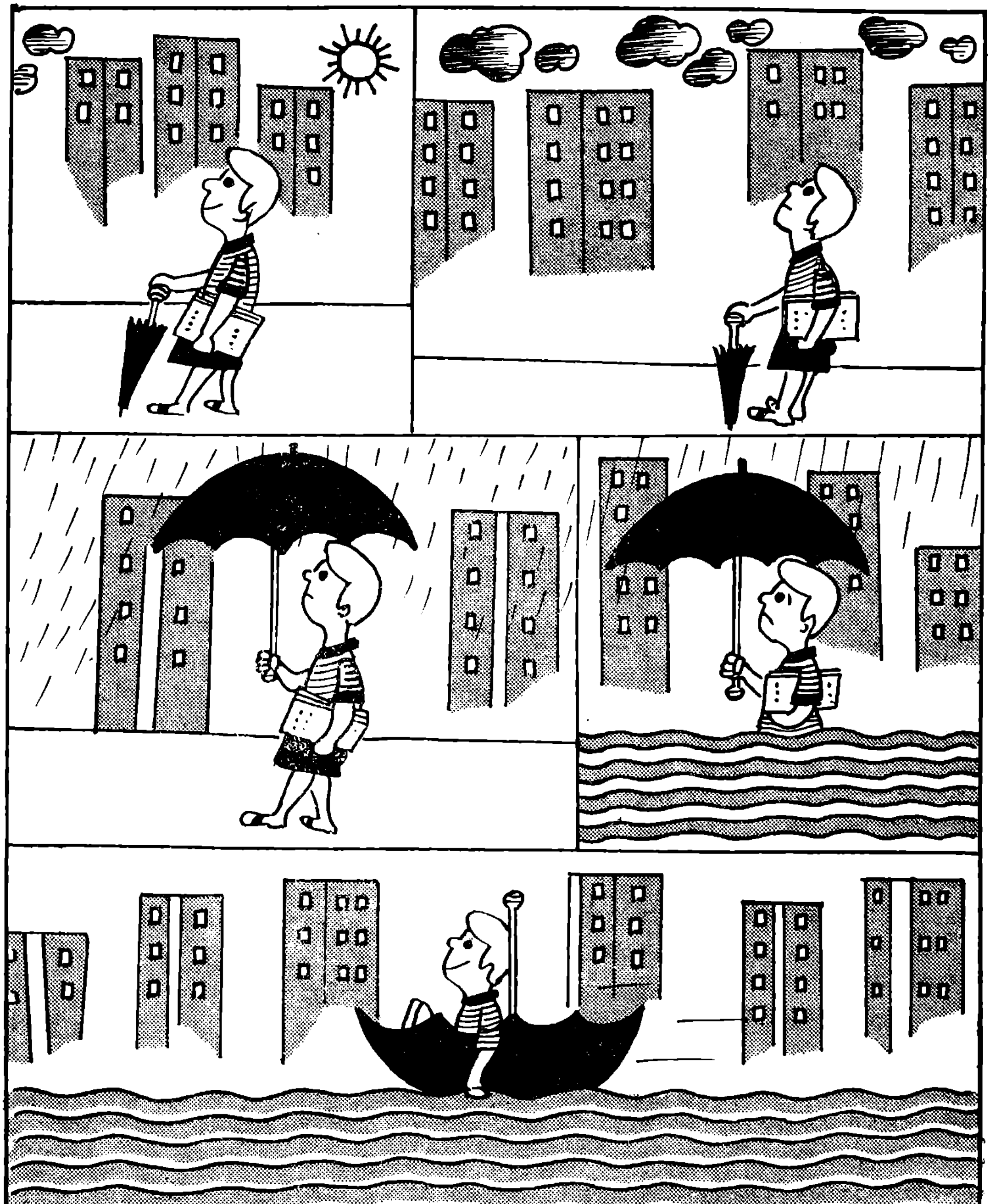

বাদশার কুকুর

রাধানাথ মন্ডল

বাদশাদের চারতলার বারান্দা থেকে দূরের একটা পার্ক দেখা যায়! যখন বাদশা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, তখনই সে পার্কের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওখানকার সমস্ত দৃশ্যই তার মুখস্থ। ওপাশটায় ফুটবল খেলা হয়। বৃষ্টি না হলে বেনচে চুপচাপ বসে থাকে দুজন লোক। দাড়িওলা একজন শেডের তলায় একটা নেড়ি কুত্তা নিয়ে সারাক্ষণ মজা করে যায়।

বাদশার চোখ এখানে গিয়েই আটকে থাকে। লোকটাকে আর কুকুরটাকে সে ভালো করে দ্যাখে। বৃষ্টি হোক আর যা-ই হোক, এরা রোজ পার্কে আসবেই। মাঝে মাঝে কুকুরটা লোকটার দাড়ির ভিতরেও তার মুখ ঢুকিয়ে দেয়। ধুতির খুঁট কামড়ে টানাটানি করে। হাঁটুর সঙ্গে মাথা দিয়ে লড়াই শুরু করে দেয়। বাদশার সবচেয়ে হাসি পায় যখন সে দ্যাখে লোকটার দুদিকের কাঁধে সামনের দুটো পা তুলে দিয়েছে কুকুরটা আর লোকটা সোজা উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটা শুরু করেছে। খুশিতে বাদশার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু বাদশার সেখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হয় না! তখনই নিচের গাড়ি বারান্দায় গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ হয়। সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে আসে! কেননা সে জানে, যদি এখানে আরও কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে পাপাকে গাড়ি নিয়ে বেরোতে দেখবে। পিছনের সিটে দেখতে পাবে জিৎ-কে। সুন্দর সাদা ঘাড় আর লকলকে লাল জিভ নিয়ে জিৎ মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে।

বাদশা ঘরে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তার দারুণ মন খারাপ হয়ে যায়। আহা জিৎ যদি তাকে একটুও ভালোবাসত! পার্কে দাড়িওলা লোকটার কথা ভেবে আরও বিশ্রী লাগে। এর চেয়ে নেড়ি কুত্তাই ভালো ছিল। কী দরকার এমন সুন্দর চেহারার! ধবধবে সাদা লোম, মাখনের মতো নরম তুলতুলে গা। এসবের কোনও দরকার ছিল না।

বাদশা ফটোর অ্যালবামটা টেনে নেয়। সেখানে অনেকগুলো ছবি বাদশার আর জিৎ-এর। তার কয়েকটা আবার রঙিন। সব পাপার তোলা। বাদশা আর জিৎ-এর এই সব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গি—ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না। সে কি এই জিৎ? এমন রাগী, এমন খারাপ? আজ জিৎ তাকে একটুও ভালোবাসে না। একদম পছন্দ করে না তাকে। অথচ সে তারই কুকুর ছিল। তার জন্যেই বাবা কিনে দিয়েছিলেন। আজ সে আর একটুও আপন নয়। আপন তো আপন, এখন জিৎ-এর সে পয়লা নমবরের শত্রু। তাকে দেখামাত্র অমন সুন্দর জিৎ এমন তেড়ে আসে যে তার ভুল হয়ে যায় একদিন জিৎ তার প্রিয় ছিল। এবং সে একা ছিল এই জিৎ-এর মালিক।

এবং এই জিৎ নামও বাদশারই রাখা। দোতলার কুকুরটার সঙ্গে এক লড়াইয়ে সে-ই জেতে। অমনি জিৎ নামটা মনে আসে বাদশার। তাই রেখে দেওয়া হয়। তারপর সব কিছুতে সে-ই জিতছে। চোরের তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি, জীবনে চুরির কল্পনা করতে সাহস হবে না যে নিরীহ লোকটির তাকেও প্রাণ ভয়ে দৌড়োতে না দেখলে জিৎ-এর শান্তি নেই।

কিন্তু সে না হয় বাইরের লোকেদের দেখলে। বাদশা কি বাইরের লোক? অসম্ভব মন খারাপ নিয়ে মাঝে মাঝে বাদশা ভেবেছে, বাইরের লোকই তো! নাহলে জিৎ কখনও তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে?

এরই মধ্যে মাঝে-মাঝে একটু-আধটু সান্ত্বনা পায় বাদশা। পাপা এবং দিদিকেও জিৎ দু-একবার তেড়ে গেছে! মা বাড়িতে থাকলে বাবা, বাবা-মা থাকলে দিদিও কোনও কোনও সময় জিৎ-এর শত্রু হয়ে ওঠে। তখন যা তার একটু ভালো লাগে। আর বাকি সময় ওঁরাই এক-একজন অভিভাবক। শান্ত জিৎ তাঁদের কথা শোনে। হাড়ের টুকরো চিবোতে চিবোতে মুখ তুলে চেয়ে দেখে। পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে জুতো শুঁকে দেয়। এমন কি অমন রাগী কুকুরটা কখনও কখনও দিদির কোলে পা তুলে দেয়। লেজ নেড়ে নেড়ে ভালোবাসা জানায়। বাদশা তখন একমনে টেলিভিসন দেখে, ওই দৃশ্য সহ্য করতে পারে না।

একদিন বিকেলে বাদশা বাড়িতে একা ছিল। বাবা-মা-দিদি সবাই বাইরে! বাড়ির কাজের লোকেরাও ছুটিতে। শুধু শিশির আছে। তার অত্যন্ত অনুগত। এখন তো বাদশাই বাড়ির মালিক! কাজেই জিৎ-এরও অভিভাবক। সে ভাবল, এ-ই সময়। আজ একটা রফা হবে। শেষবারের মতো সে জিৎ-এর সঙ্গে বোঝাপড়া করবে! জিৎ-কে বুঝিয়েও কিছু বলবে। বলবে বাদশা কত ভালবাসে, কত আদর ক'রে তার নাম রেখেছিল। অথচ কেন তার সঙ্গে এমন রাগারাগি করে! তাছাড়া জিৎ, তুমি আমাকে কামড়াতেও যাও। জানো না, কুকুর

কামড়ালে খুব খারাপ। অসুখ হয়। আমি তোমাকে এত ভালোবাসি! কেউ ভালোবাসলে তাকেও ভালোবাসতে হয়। তাকে কি কামড়ানো উচিত?

খুব গম্ভীর হয়ে, যেন পাপা, বাদশা জিৎ-এর কাছে যায়। তার শিকল ধরে। জিৎ প্রথমে অবাক হয়ে বাদশাকে দেখছিল। যত বাদশা এগিয়ে আসে, জিৎ ততই আশ্চর্য হয়। তারপর গলায় টান পড়ামাত্র সে ঘেউ করে লাফিয়ে বাদশার ঘাড়ে উঠে পড়ে। বাদশা প্রথমে ভয় খেয়ে যায়! তাড়াতাড়ি পিছিয়ে আসে। তারপর সে পিঠে আঁচড়ের জ্বালা বোধ করে। তার ভীষণ দুঃখ হয়। চেয়ে দেখে শিশির হাসছে। খুব রেগে গিয়ে তাকে একটা চড় মারে। তারপর দরজা বন্ধ করে সে কেঁদে ফেলে।

॥ দুই ॥

বাদশা আজকাল সব সময় মন মরা হয়ে থাকে। পড়তে বসলে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। খাবার টেবিলে অনেক ক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে! কোনও কিছু জিগেস করলে হ্যাঁ-না করে জবাব দেয়। খেলাতেও তার তেমন মন বসে না। এমন কি, দিদিরা একদিন সিনেমা গেল, বাদশা গেল না!

বাদশা এখন রোজ সকালে ওঠে, পড়াশুনো করে। স্কুলে যায়। ফিরে এসে টেলিভিসন দেখে। ওইটুকু ছেলে বাদশা, তবু এমন গম্ভীর থাকে যে, তাকে বড় মানুষের মতো দেখায়! তার প্রিয় জিনিসগুলি দিদিকে অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে দিয়ে দেয়। কোনও কিছুতে সে আপত্তি করে না। মা যা বলেন, দিদি যা বলে, সে তাই করে।

বাদশার এই পরিবর্তনে বাড়িসুদ্ধ সবাই আশ্চর্য। দিদি একদিন ঠাট্টা করে বলল, বাদশা, তুই এমন সুবোধ বালক হয়ে গেছিস যে তোকে গোপাল বলে না ডাকলে বিদ্যাসাগর মশাইকে অপমান করা হবে!

আশ্চর্য, বাদশা সম্মতি দিল। এখন থেকে সবাই তাকে গোপাল বলেই ডাকবে। প্রথমে দিদি, তারপর শিশির, তারপর আর আর সকলে গোপাল নামে ডাকে।

গোপাল খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করে। মাস্টার-মশাইদের কথা সে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে! খাতা ভর্তি করে হোম্ টাসক্ করে রাখে। খেতে বসার আগে তাকে হাত ধোয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে হয় না। সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠে আসে, ধীরে ধীরে একটা একটা করে সিঁড়ি ভেঙে ওঠে। ইতিমধ্যে ক্লাশের একটা পরীক্ষাতে খুব ভালো রেজালটও করল।

সবাই গোপালের উপর খুশি। মাস্টারমশাইরাও গোপালের সুনামে পঞ্চমুখ। এইভাবে যখন দিন যাচ্ছিল, তখন একদিন, বাংলার মাস্টারমশাই একটা কবিতার নামকরণ পড়াচ্ছিলেন! মাস্টারমশাই বলছিলেন, নামে কী আসে যায়? গোপালকে যে-নামেই ডাকো, সে সুন্দর! হঠাৎ শান্ত গোপাল প্রবলভাবে আপত্তি করে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, না মাস্টারমশাই আপনি জানেন না, নামে অনেক কিছু আসে যায়!

মাস্টারমশাই একটু অপ্রতিভ হন। এই বিনীত, মুখচোরা ছেলেটি হঠাৎ কেন এমন চেঁচিয়ে উঠল সঠিক বুঝে উঠতে পারেন না।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে গোপাল একদিন স্কুল থেকে অনেক দেরি করে ফেরে। উদ্বিগ্ন গলায় দিদি জিগেস করে, কীরে, আজ এত দেরি?

খুশিতে উচ্ছল সে এই কথায় কান না দিয়ে বলে, দিদি জানিস, আজ একটা জিনিস এনেছি।

দিদি তাকে এত খুশি অনেক দিন দেখেনি! কী এনেছিস বাদশা? দিদি হেসে জিগেস করে।

অত্যন্ত সাবধানে ব্যাগ থেকে যা বের করে তা একটা কুকুর।

কুকুর! দিদি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, কুকুর! কুকুর কী হবে?

—কেন, আমি পুষব! হাত-পা ছড়িয়ে আয়েসী ভঙ্গিতে বাদশা জবাব দেয়।

পুষবি? আমাদের কুকুর তো আছে!

ওটা তো তোদের। এটা আমার।

দিদি ভীষণ অবাক হয়। কিছুদিন ধরে যে শান্ত গোপালটিকে দেখছিল, এই জেদী বাদশার সঙ্গে তার যেন একটুও মিল খুঁজে পায় না। সে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, তোর একার জন্যে একটা কুকুর?

—হ্যাঁ, আমার একার জন্যে। আমার কথা শুনবে। আমার হুকুম-মতো চলবে। আমাকে কামড়াতে আসবে না। আমাকে ভালোবাসবে।

—যা খুশি কর। আমি কিচ্ছু জানি না—

বলে রেগে তার দিদি চলে যায়।

বাদশা ডাকে, শুনে যা দিদি, এর একটা নাম ঠিক করেছি।

যেতে যেতে দিদি ঘুরে দাঁড়িয়ে জিগেস করে, কী?

হার।

—হার? সে আবার কী? দিদি জিগেস করে।

খুব স্পষ্ট করে বাদশা থেমে থেমে জবাব দেয়। সে যা-ই হোক, এর নাম হার।

একা রাজু

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

রাজুর বয়স পনেরো বছর। রাজুর ধারণা পনেরো বছর বয়সটা নিতান্ত কম নয়। রাজুর মা বাবার ধারণা ঠিক উল্টো। তাঁরা মনে করেন পনেরো বছর বয়সটা নিতান্তই কম। ফলে রাজুর সঙ্গে রাজুর মা বাবার যে রীতিমত বিরোধ দেখা দেবে এতে আর সন্দেহ কি? রাজুর তাই ভরসা দিদা। দিদা যে আবার রাজুর বাবার পনেরো বছর বয়সটাও দেখেছে, দিদা তাই উদার। আর ছোট পিসিমণি। দিদা আর ছোট পিসিমণিই রাজুকে বাঁচিয়ে রেখেছে। নইলে মা বাবাকে নিয়ে কি পারা যেত? খালি এখানে যেও না, সেখানে যেও না, এটা কোরো না, সেটা কোরো না। ভারী রাগ হয় রাজুর। আর কত বড় হবে? এই তো মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া হয়ে গেল, এরপরে কলেজে পড়বে তাতেও বড় হওয়া যায় না।

জীবনে প্রথম একা একা ডায়মন্ডহারবার যাবে রাজু। ডায়মন্ডহারবার আর কিই-বা দূরে। তাতেও কি কম বাধা। মা বাবা কিছুতেই রাজী নয়। কত ব্যাপারেই তো মা বাবার মতের মিল হয় না রাজু দেখেছে। বাবা যা বলে মা ঠিক তার উল্টো কথা বলে। এরকম তো প্রায়ই হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে রাজুকে কোথাও যেতে না দেওয়ার ব্যাপারে দুজনের মতের অমিল হয় না কক্ষনো, কি আর করা। রাজুর তখন সেই দিদাই ভরসা। দিদারও তেমন ইচ্ছে নেই। কি এমন আছে ডায়মন্ডহারবারে। ওখানে যেতে হবে না একা একা, তোকে পুরী নিয়ে যাব সমুদ্র দেখাতে। তখন যাস। রাজু বলে অমৃত জিনিষটা রসের মধ্যে নেই রস বোধের মধ্যে আছে। দেখার আনন্দটা কি দেখার জিনিষের মধ্যে? ওটা থাকে দেখার ক্ষমতার মধ্যে। এই ধরণের কথা রাজু কিছুদিন আগে কোথাও পড়েছে। উদ্ধৃতিটা ঠিকঠাক হল কিনা কে জানে। না হলেও ক্ষতি নেই, দিদা অতশত বুঝবে না। এইরকম বড় বড় কথা বলতে খুব ভালোবাসে রাজু। কিন্তু মা বাবার সামনে কি বলার উপায় আছে। বাবা এমন ভঙ্গীতে হাসবে যে রাজুর কান্না পেয়ে যাবে আর মা তো বলবেই এদিক নেই ওদিক আছে। আর কিছু হচ্ছে না খালি পাকা পাকা কথা শেখা হচ্ছে। রাজু তাই মা বাবার সামনে ছোটটি সেজে থাকে। কেমন ঠকানো। রাজু যে মনে মনে কত বড় হয়ে কত কিছু জেনে গেছে তোমরা তার কি বোঝ? রাজুর তাই এখন খালি অপেক্ষা কবে পুরোপুরি বড় হয়ে উঠবে, কবে তাকে সবাই বড় বলে সম্মান সমীহ করবে।

জীবনে প্রথম একা একা ডায়মন্ডহারবারের বাসে বসে রাজু নিজের স্বাধীনতায় নিজেই কেমন উদ্বেল হয়ে ওঠে। যেন সে কতদূরে যাচ্ছে। একেবারে একা এমন কি কোনো বন্ধুবান্ধবও নেই সঙ্গে। যদি সে কোনোদিন একা একা প্লেনে চড়ে সাত সমুদ্র তেরোনদীর পারে যায়, এর চাইতে বেশী স্বাধীন কি মনে হবে নিজেকে। এর চাইতে বেশী রোমাঞ্চিত হবে নিজের একাকীত্বে। মনে হয় না। ভাগ্যিস জন্মেছিলাম। হঠাৎ একথা মনে হয় রাজুর। ছোট পিসিমণির কথা মনে হয়। ছোট পিসিমণিটার যে কি দুঃখ কে জানে, রাজুকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে, মনে হয় যেন এই পৃথিবীতে নেই। রাজু একদিন বলেছিল কি এত চিন্তা কর তুমি ছোট পিসিমণি। ছোট পিসিমণি তার উত্তরে বলেছিল যদি না জন্মাতাম খুব ভালো হত। কি কথার কি উত্তর রাজু তখন বলেছিল না জন্মালে আমি মরেই যেতাম, না জন্মানোর দুঃখে মরে যেতাম। না জন্মালে মরে যেতিস? এমন মজার মজার কথা বলিস তুই রাজু বলে ছোট পিসিমণি হেসে উঠেছিল, রাজুও হেসে উঠেছিল এক পলক কথাটা চিন্তা করে নিয়ে সত্যিই কথাটা ভারী মজার হয়ে গিয়েছে তো।

ভাবতে রাজুরও খুব ভালো লাগে। কিন্তু ওরকম দুঃখ দুঃখ মুখ নিয়ে দুঃখ দুঃখ ভাবনা ভালো লাগে না। সে কি হবে না হবে কি করবে না করবে বড় হয়ে, এসব ভাবনাই ভাবতে ভালো লাগে রাজুর। সবাই বলে রাজু খুব ভালো ছবি আঁকে। রাজুরও তাই ধারণা, রাজু মনে মনে ভাবে বড় হলে আর্টিষ্ট হবে। কিন্তু মা বাবা বলে আর্টিষ্ট হওয়া নাকি সোজা না, কে জানে। সেদিন তাই রাজু ছোট পিসিমণিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা ছোট পিসিমণি বল না আমি বড় হয়ে আর্টিষ্ট হতে পারবো কিনা? ছোট পিসিমণি বললো সবই ভাগ্য রাজু, তোর ভাগ্যে থাকলে হবি। রাজুর এসব কথা একেবারে ভালো লাগে না। ভাগ্য আবার কি? সে যদি ভালো ছবি আঁকতে পারে তাহলে কেন আর্টিষ্ট হতে পারবে না? সেই ফটো বাঁধাইয়ের দোকানদারটা কেমন তাকে আর্টিষ্ট বললো, আপনি বুঝি আর্টিষ্ট? ভারী মজা লেগেছিল রাজুর, দিদা একটা ফটো বাঁধাতে দিয়েছিল, সেটা নিয়ে বাঁধাতে গিয়েছিল দোকানে হঠাৎ কি খেয়ালে রাজু জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা একটা দু ফুট বাই চার ফুট হাতে আঁকা ছবি বাঁধাতে কত লাগবে? ফটো বাঁধাইওয়ালা কেমন সমীহ

করে তাকে জিজ্ঞাসা করল আপনি বুঝি আর্টিস্ট ? আপনি আবার আর্টিস্ট, এত সম্মান কি কেউ কখনো দিয়েছে রাজুকে। সারাটা দিন রাজুর কানে প্রশ্নটা বাজছিল আপনি বুঝি আর্টিস্ট।

দূরে চলে যাচ্ছে একা একা।

রাজুর কানে বাজছে ফটো বাঁধাইওয়ালার প্রশ্নটা আপনি বুঝি আর্টিস্ট ? গাছপালা রাস্তা মেঘ সবাই যেন রাজুকে বলছে আপনি বুঝি আর্টিস্ট ? কোথায় কত দূরে যাচ্ছে

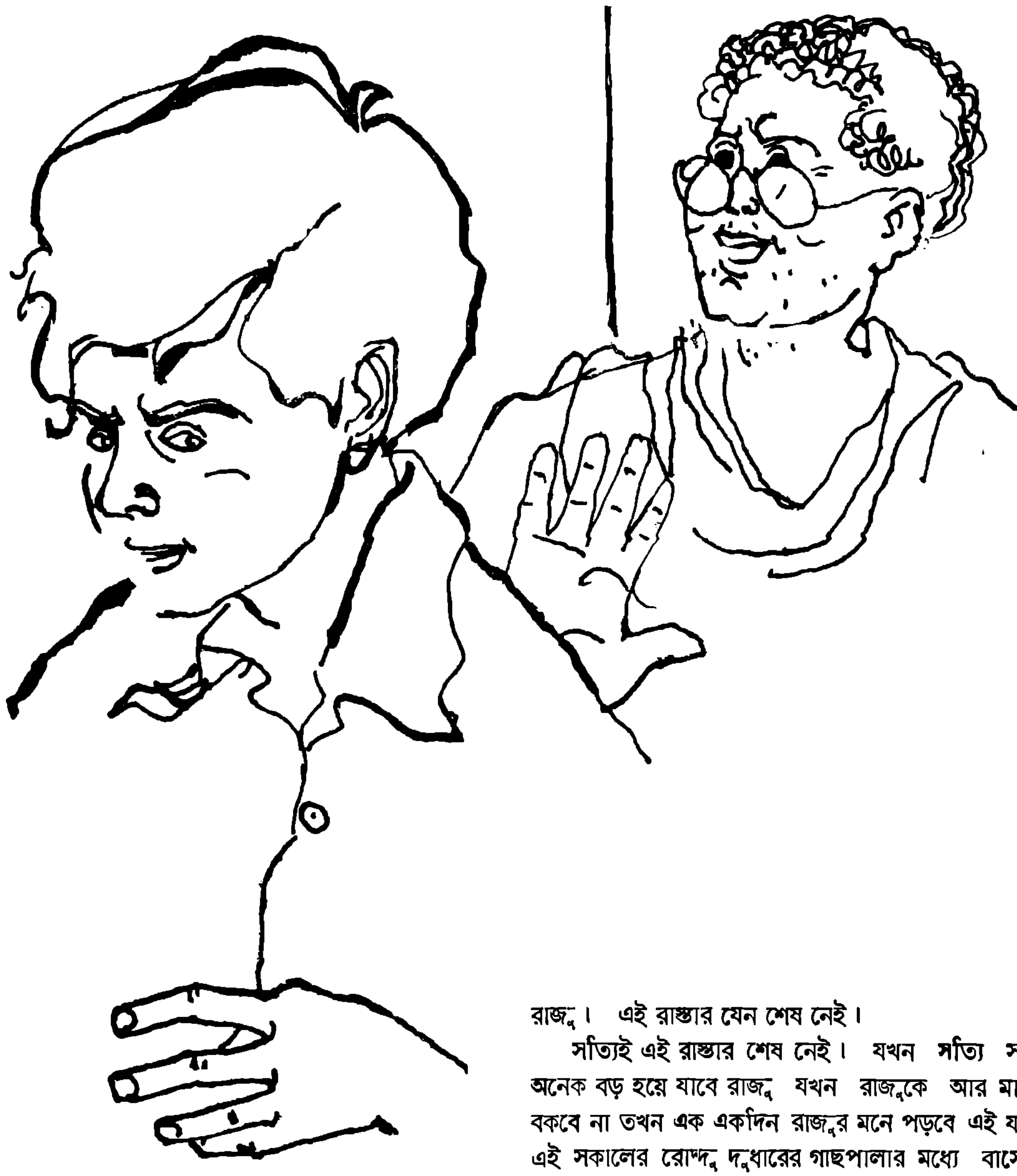

বাসটা শহরটহর ছাড়িয়ে চলে এসেছে, ফাঁকা রাস্তা। সোঁ সাঁ চলছে বাসটা। কি আনন্দ যে লাগছে। ডায়মণ্ড-হারবার আর কত দূর। রাজুর মনে হচ্ছে সে যেন কত

রাজু। এই রাস্তার যেন শেষ নেই।

সত্যিই এই রাস্তার শেষ নেই। যখন সত্যি সত্যিই অনেক বড় হয়ে যাবে রাজু যখন রাজুকে আর মা বাবা বকবে না তখন এক একদিন রাজুর মনে পড়বে এই যাওয়া, এই সকালের রোদ্দু দুধারের গাছপালার মধ্যে বাসে চড়ে সোঁ সাঁ একা একা চলে যাওয়া, মনে পড়ে খুব মন কেমন করবে রাজুর, কারণ তখন তো রাজু সত্যি সত্যি বড় হয়েই গেছে। রাজু এখন তা জানে না !

ছড়ার ফ্যাচাং

ছবি ও ছড়া ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

হ্যাচাং ফ্যাচাং হাঁচ্ছো,
ধিতাং ঘিতাং নাচ্ছো।
হ্যাচাং বাধায় ফ্যাচাং,
কাটলো মাথা ঘ্যাচাং।

বকর বকর বকছো,
কাশছো খকর খক্ ;
এক্ষুনি যাও বদ্যি আনো,
সব দিয়েছে জক।

ফিক ফিকিয়ে হাসছো !
বেশ মজাটা পাচ্ছো।
লঘু-গুরুর বালাই নেই,
লোকের কথায় নাচছো।

ফ্যাচর ফ্যাচর কান্না,
শুন্যি হাড়ি, রান্না।
না পড়তেই পাত
খাচ্ছি হাওয়া, আন্না।

পত্রপাঠ

[প্রশ্ন যেন তোমার মতনই হয়, গন্ডী ছাড়ায় না যেন।]

* দীপিকা দত্ত, চাঁপাডাঙ্গা

—আমি পক্ষিরাজের একজন কিশোরী পাঠিকা। এই পত্রিকার নিয়মিত ফিচার 'সকালবেলা'-র লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের বিরুদ্ধে আমার একটি অভিযোগ আছে। গত দুই সংখ্যায় তিনি স্মৃতি-কথায় শুধু কিশোরদেরই উদ্দেশ্য করে লিখেছেন। তাদের মানসিক অস্থিরতা, অনুভূতি আর আবেগের কথা। কিন্তু কিশোরীদের উদ্দেশে লিখেছেন—'নিজেকে নিয়ে নিজেই, কস্তুরী মৃগ যেমন। না, তাও না। ওরা তো আপনার সুগন্ধে বিভোর।' কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমাদের মনের গভীরেও কি অকারণ অস্থিরতা নেই? আমার মনে হয় আছে। এবং সেকথাও তাঁকেই শোনাতে হবে তাঁর সকালবেলাতেই।

ঃ উত্তর লেখকই দেবেন যেকোনও এক সকালবেলাতে।

* মহুয়া মিত্র, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

—আমাদের একটা পাখি আছে। এই পাখিটার গায়ে যখনই হাত দিই, মনে হয় তার গাটা বেশ গরম। এদের দেহের তাপ কি আমাদের চেয়ে বেশী?

ঃ হ্যাঁ, এদের দেহের তাপ সাধারণত ১০৪ ডিগ্রী থেকে ১১০ ডিগ্রী ফারেনহিট। আমাদের গায়ে ৯৬ ডিগ্রী স্বাভাবিক, ১০৬ ডিগ্রী নিদারুণ জ্বর, আর ১১০ ডিগ্রী হলে মৃত্যু অবধারিত!

* কমল সাহা, শ্রীরামপুর, হুগলী

—পরের উপকার করলে নিজের ক্ষতি হয়। এই প্রবাদটা কি সত্য?

ঃ নিজে লাভবান হলে আর পরের উপকার হবে কি করে ভাই।

—আপনি ভূতকে ভয় করেন?

ঃ হ্যাঁ, তবে নিরাকার ভূতকে নয়, কাপড় জামা পরা ভূতকে।

* অশোক মন্ডল, আনারা, পুরুলিয়া

—আমাদের দেশে বড়লোক আর গরীবলোকের ভেদা-ভেদ কবে ঘুচবে?

ঃ মানুষের মনের অন্ধকার ঘুচলেই।

* মনমোহন চৌধুরী, কলিকাতা-২৬

—লোভের জন্য পাপ হয়, না পাপের জন্য লোভ হয়?

ঃ লোভে পাপ!

* তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণাঘাট

—বলতে পারেন বাঘের খপ্পরে পড়লে বেশী ভয়, না মানুষের খপ্পরে পড়লে বেশী ভয়?

ঃ বাঘ যদি মানুষ খেকো হয় আর মানুষ যদি বাঘ খেকো হয় দুই-ই বিপজ্জনক।

* অপর্ণা, আরতী ও গার্গী, অন্ডাল, বর্ধমান

—খেলার রাজা পেলে কলকাতায় ভাল খেলতে পারল না কেন?

ঃ সিংহ সিংহ দেখলেই তো গর্জন করে ওঠে ভাই!

* শাশ্বতী ও সঙ্গীতা, গভঃ কলোনী, বেহালা

—আমাদের এই প্রিয় পত্রিকাটির নাম পক্ষিরাজ রাখা হল কেন?

ঃ মনের গভীরে যাবার ছাড়পত্র একমাত্র তারই আছে বলেই।

* উৎপল ধর, তুরা. মেঘালয়

—'চরিত্র' যদি সবচেয়ে দামী হয়, তাহলে সবচেয়ে কমদামী কি?

ঃ (চরিত্র) হীনতা!

* গোপালচন্দ্র রায়, বারাকপুর

—সবচেয়ে কঠিন জিনিস কি আছে পৃথিবীতে?

ঃ জানো না—গোঁ!

* তন্দ্রা বসু, বেহালা

—বই পড়ার কি কোনও বাঁধাধরা বয়স আছে?

ঃ আছে। যেমন শৈশবে হাসিখুশি, যৌবনে নাটক নভেল, বার্ধক্যে ধর্মপুস্তক **রামায়ণ মহাভারত!**

* সুকেশ ও সপ্তর্ষি, বড়জোড়া

—আষাঢ় সংখ্যায় নব কথামালা নেই কেন?

ঃ পাঠকেরা নবতম কথামালা দেখতে চাইছে।

* লালি ও মামনি মিত্র, কিষাণগঞ্জ বাজার, বিহার

—পক্ষিরাজের বয়স ৬ মাস হলে, অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ পাব তো?

ঃ নিশ্চয়ই, তবে মহাশূন্যে যেতে আপত্তি নেই তো?

* সুচনা মিত্র, দুর্গাপুর

—জাতিস্মরত্বের কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে?

ঃ না। ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নিছকই ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে এর অস্তিত্ব জড়িত।

—ইতিহাসে কোথায় এর উল্লেখ আছে?

ঃ বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী এরই পটভূমিকায় লিখিত। তাছাড়া মহাভারত বনপর্বে এক জায়গায় উল্লেখ আছে—জাতিস্মর নামে এক হ্রদ ছিল, এই হ্রদে স্নান করলে জাতিস্মর হত।

ভেবে ভেবে সমাধান—প্রতিযোগিতা—ভাদ্র মাস

* ইস্কুলে বা কলেজে পাঠরত যে কোন পড়ুয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে।
* এই প্রতিযোগিতার উত্তর ভাদ্র মাসের মধ্যেই পক্ষিরাজ কার্যালয়ে অবশ্যই পেঁছানো চাই।
* কার্যালয়ে গচ্ছিত সমাধানের সঙ্গে হুবহু মিলে গেলেই নির্ভুল বলে গণ্য হবে।
* পুরস্কারের পরিমাণ ৫০ টাকা মূল্যের বই। নির্ভুল উত্তর একাধিক হলে টাকা ভাগ হবে।
* উত্তরের সঙ্গে নিচের অংশটি অবশ্যই কেটে পাঠাতে হবে। নইলে উত্তর পত্র গ্রাহ্য হবে না। খামের ওপরে লিখে দিতে হবে ঃ **ভেবে ভেবে সমাধান প্রতিযোগিতার উত্তর**। ভিতরে যেন অন্য লেখা না থাকে।

উত্তরের সংগে নিচের ছাপা অংশটিই কেটে পূরণ করে পাঠাতে হবে। কপি করে পূরণ করলে হবে না।

নাম ... ...

অভিভাবক ... ...

ঠিকানা ... ...

ইস্কুল বা কলেজ ... ...

ঠিকানা ... ...

... ...

শীল

ইস্কুল বা কলেজের প্রধানের স্বাক্ষর

ছবি দেখে গল্প বলো—প্রতিযোগিতা—ভাদ্র মাস

১ম পুরস্কার—উষারাণী করাতি স্মৃতি পুরস্কার—৩০ টাকা

২য় পুরস্কার—মনোহর করাতি প্রদত্ত উৎসাহ পুরস্কার—২৫ টাকা

৩য় পুরস্কার—পক্ষিরাজ পত্রিকা প্রদত্ত সান্ত্বনা পুরস্কার—২০ টাকা

* ১১ আশ্বিনের মধ্যে (২৮ সেপ্টেম্বর) লেখা পক্ষিরাজের কার্যালয়ে পেঁছানো চাই।
* এই প্রতিযোগিতা যিনি পরিচালনা করছেন তাঁর বিচারই চূড়ান্ত।
* হাফ ফুলস্ক্যাপ কাগজের শুধু এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে। পিছনের পৃষ্ঠা সাদা থাকবে।

লেখার সংগে নিচের ছাপা অংশটি অবশ্যই কেটে পূরণ করে পাঠাতে হবে। কপি করে পূরণ করলে হবে না।

নাম ... ... বয়স ... ...

ঠিকানা ... ...

... ...

পেশা ... ...

স্বাক্ষর

এস, আমরা বাংলা শিখি

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

এবারে এস আমরা অন্যদিকে একটু চোখ ফেরাই। বাংলা গদ্য নিয়ে কিছু কথাবার্তা হলে কেমন হয়? বাংলা গদ্য অনেকটাই ইংরেজি গদ্যের আদলে তৈরি, যদিও বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের সবচেয়ে শেষে বসে। বাংলায় ক্রিয়াপদ কম, তার ওপরে তাদের বদলে-যাওয়া রূপগুলো প্রায় একধরণের, সেজন্য সাধারণ গদ্যে বড় একঘেয়েমি (monotony) আসে। এই একঘেয়েমি এড়াতে আজকাল লেখকরা ক্রিয়াপদকে মাঝখানে নিয়ে আসেন, কখনও বা বাদ দেন। বিদ্যাসাগর আধুনিক বাংলা গদ্যের যে প্রাথমিক রূপ দিয়েছেন, তার প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানিয়েই বলছি, বাংলা গদ্য তারপরে ক্রমশই পালটে পালটে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। গদ্যের 'ডিকশন' বদলে গদ্যকে ক্রমশ উন্নত করেছেন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মনোযোগী অনেকেই। কিন্তু এর মধ্যে যাদের নাম, আমার মনে হয়, উল্লেখ করতেই হবে, তাঁরা হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু। এবং এরকম আরও কয়েকজন। শুধু শুদ্ধ নয়, সুপাঠ্য গদ্য লিখতে পারাটাও নিশ্চয় বাংলা শেখার অন্যতম লক্ষ হওয়া উচিত, কী বল? পড়ে দেখ এই সাধু ভাষার বাংলা উদ্ধৃতিটুকু—"কাল আমার কন্যা ২৭ বৎসর বয়সে ছয়মাস রোগ ভোগের পর কোথায় চলিয়া গিয়াছে—ছয়মাস কাল কি যে আসুরিক যাতনা সহিয়াছে, তাহা কি লিখিব।...বিশ্ব ব্যাপারের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছি—নগ্ন মূর্ত্তি মরণের সম্মুখে প্রণাম করিয়াছি। পরম কারুণিকের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া যে শান্তি, সে শান্তিলাভে আমি বঞ্চিত। চলিত ভাষায় আমি নাস্তিক। সেকথা তুলিয়া আমাকে প্রবোধ দিবেন না। নিজস্ব মরমের ব্যথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নাই, —কিন্তু আপনাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না।"

১৩২৫ সালে রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে এই কথাগুলি লিখেছিলেন। তোমরা এখন যদি সম্পূর্ণ না-ও বোঝ, পরে বুঝতে পারবে—এই বিজ্ঞানী লেখক কী পরিচ্ছন্ন, সুন্দর বাংলা গদ্য রচনা করে গেছেন। অবশ্য এও লক্ষ করবে, ষাট বছর আগেকার প্রচলিত সাধু ভাষা ও তার সঙ্গে মানানসই বানান এখন আর লেখা হয় না। কিন্তু এই শব্দ নির্বাচন ও রচনা শৈলী, যাকে 'ডিকশন' বলেছি আগে, বাংলা গদ্যের একটি আদর্শ।

আর যে তিনজনের নাম আমি উল্লেখ করেছি, তাঁদের রচনা তোমরা সম্ভবত হাতের কাছে পাবে। সুযোগ পেলেই তাঁদের লেখা গদ্য পড়বে—গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিঠি, রম্যরচনা—যা-ই হোক না কেন। সুষ্ঠু আধুনিক গদ্যের পেছনে আছে এঁদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম।

গদ্যের একটা ছোট জায়গা নিয়ে ভাবা যাক। চিঠি। গল্পের ভাষার সঙ্গে যেমন প্রবন্ধের ভাষার পার্থক্য আছে, তেমনি প্রবন্ধের সঙ্গে আছে চিঠির। বিখ্যাত সাহিত্যিক-দের চিঠিও যে রীতিমত সাহিত্যসৃষ্টি, তার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র থেকে। আমরা সে সম্পর্কে আলোচনায় যাচ্ছি না। সাধারণ চিঠির কথা বলছি। তোমাদের বাড়িতে নানারকম চিঠি আসে, দেখেছ নিশ্চয়? আত্মীয়দের চিঠি, বন্ধুবান্ধবের চিঠি, নিমন্ত্রণ লিপি, আবেদন পত্র—আরও কত কী। আচ্ছা লক্ষ করেছ কি যে চিঠির ভেতরের ভাষা যত আধুনিক, চিঠির বহিরাঙ্গ আদবকায়দা সে রকম নয়? চিঠির আরম্ভে শ্রীচরণেষু প্রীতিভাজনেষু, কল্যাণীয়াসু লেখার পদ্ধতি সেই কতকাল আগে শুরু হয়েছিল, এখনও তা বিনা প্রতিবাদে কেমন চলছে। আমরা তো সংস্কৃতে চিঠি লিখছি না, তাহলে এই 'ষু' বা 'সু' কেন এখনও সঙ্গে সঙ্গে চলছে? যদি লিখি শ্রদ্ধেয় কাকাবাবু, প্রিয় ভাস্কর বা স্নেহের রুন্টু—তাহলে কি চিঠিগুলি বাংলার আরও কাছাকাছি, আরও আপন হয় না? তার মানে এই নয় যে আমি জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠের সঙ্গে ভক্তি ভালবাসার সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিতে চাই। বরং আমি চাইছি সম্পর্কগুলি আরও সহজ হোক, বাংলা চিঠি তার পোশাক, আদবকায়দা চেহারা ও বক্তব্য নিয়ে মুখোমুখি কথা বলার মত স্পষ্ট হয়ে উঠুক। প্রণম্যকে প্রণাম নিশ্চয় জানাতে হবে, কিন্তু তারপরে আবার প্রণত বা সেবক বলে অধিক আত্মনিবেদন অথবা আশীর্বাদক বলে অহং প্রকাশ আধুনিক ভাষার সঙ্গে খাপ খায় না, বাহুল্য মনে হয়। আমি জানি, তোমাদের অভ্যাস আমার এই আলোচনায় ধাক্কা খাবে এবং তোমাদের জ্যেষ্ঠদের মধ্যে কেউ বা ক্ষুণ্ণ হবেন। কিন্তু যে কোন পরিবর্তনই তো ধাক্কা দেয়, ক্ষোভ জাগায়, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তোমরা নিজেরা চিন্তা করে দেখ—আমার প্রস্তাব বাংলাভাষার পক্ষে উপযোগী কিনা, পরিবর্তন ভাষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে কিনা, বাংলা চিঠির 'ডিকশন' বদলান দরকার কিনা। চিঠি তোমাদের খুব কাছের জিনিস, তাই এবারে চিঠিতেই আমার জিজ্ঞাসা নিবদ্ধ থাক।

প্রসঙ্গত জানাই, তোমাদের লেখা চিঠি পেয়েছি, পরেরবারে কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তর দেব।

মুক্তশিক্ষা

সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

[শিক্ষাবিদ সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সুদীর্ঘ দিন শিক্ষাজগতের সঙ্গে যুক্ত। এই সেদিনও তিনি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন। সবশেষে দিল্লীতে শিক্ষা-গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় পরিষদের (এন সি ই আর টির) অন্যতম পরামর্শ-দাতা ছিলেন।]

জনৈক পাঠক জানতে চেয়েছেন, 'মুক্ত-শিক্ষা' কথাটির প্রকৃত অর্থ কী, এবং ইস্কুলের বাঁধা-ধরা ছকের বাইরে এধরণের শিক্ষা পড়ুয়াদের পক্ষে কতটুকু উপযোগী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এসেছে বিজ্ঞান বিষয়ে। বই-পত্রের মাধ্যমে ক্লাশে যে-বিজ্ঞান পড়ানো হয় তার সঙ্গে প্রকৃতিমুখী বা সহজ বিজ্ঞানের পার্থক্য কোথায়, কেমন ভাবেই-বা তা পড়ুয়াদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব।

যেহেতু মুক্ত-শিক্ষা কথাটির ব্যবহারে কিছুটা নতুনত্ব আছে, সেজন্য প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি পড়ুয়াদের উদ্দেশে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে তরুণ পাঠকদের নিজস্ব অভিমত কিছু কিছু জেনে নিতে চাই। কেননা, এ-আসরে এক তরফা লেখার চাইতে ভাবের আদান-প্রদানটাই বড় কথা।

ইস্কুলের লেখাপড়ার ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে অল্প বিস্তর সকলেরই পরিচয় আছে। নিয়ম মাফিক ক্লাশে ভর্তি হয়ে বৎসরান্তে ক্লাশ প্রমোশন পেয়ে পেয়ে উপরের দিকে উঠতে হবে, নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় যথা ভাষা, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সিলেবাসের ছক অনুযায়ী পড়তে বা শিখতে হবে, তারপর কোর্স অন্তে এককালীন পরীক্ষা দিয়ে পাশ বা ফেলের প্রমাণ-পত্র অর্জন করতে হবে। এর নাম ফর্ম্যাল এডুকেশন বা মামুলি শিক্ষা। বিধি নিয়মের বহু বন্ধন এতে বর্তমান। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে তিনটি ঃ

(১) সিলেবাস বা পাঠক্রমের বেষ্টনী।
(২) ক্লাশের সময় সীমা।
(৩) পরীক্ষার ও পাশ ফেলের নিয়মনীতি।

যেখানে এসবের বালাই নেই, পড়ুয়াদের আপন আপন সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী এগিয়ে যাবার স্বাধীনতা আছে, লেখা ও পড়ার সঙ্গে জীবনমুখী 'আরো-কিছু' অর্জনের পথ যেখানে প্রশস্ত, সেখানেই মুক্ত শিক্ষার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। কেউ কেউ একে বলেছেন 'নন-ফর্ম্যাল'। কিন্তু নেতিবাচক সংজ্ঞায় মন ভরে না। এর একটা অস্তিবাচক দিকও থাকা উচিত, যার ফলে দেহ, মন ও ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত বিকাশ ঘটানো সম্ভব হতে পারে। ক্লাশের রুটিনে সামিল হতে না পেরে কতোনা কুসুম অকালে ঝরে যায়! অনাবশ্যক বোঝা বইতে না-পেরে কতোনা ছেলে-মেয়ের আত্মবিকাশের পথ কৃত্রিম ফেলের কলঙ্কে অবরুদ্ধ হয়ে যায়!

মুক্তশিক্ষা এই হাত-গড়া বেড়াজাল থেকে পড়ুয়াকে মুক্তি দিতে চায়। এর প্রথম লক্ষ্য যেখানে-যখন-যেভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ থাকে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। পড়ার খরচ জোগাতে না-পেরে অথবা ঘর-সংসারের কাজ ছেড়ে ইস্কুলে যাবার সময় না-পেয়ে যারা বঞ্চিত, শুধু তাদের জন্যই মুক্তশিক্ষা, এটি ভুল কথা। জল, বাতাস, আলো আকাশের মত এতে সকলেরই সমান অধিকার। শুধু তাই নয়। পুঁথি-ঘেষা লেখাপড়াকে প্রাণবন্ত ও উদার করার জন্য সকলের পক্ষে এটি সমান জরুরী। ঘরে বাইরে, সমাজে জীবনে, লেখাপড়ার যে-খাতা যে-বই ছড়িয়ে আছে তাকে ঠিকমতো কাজে লাগানোর অপর নাম মুক্ত শিক্ষা।

এ-শিক্ষা লাভ অল্প বিস্তর এমনিতেই হয়ে থাকে, যদিও তার মর্যাদা দেওয়া হয় না সব-সময়। যদি তা হোত, তাহলে শিক্ষিতের খতিয়ানে অনেকেরই নাম উঠত যারা ইস্কুলে যেতে পারেনি কোনোদিন। কে এদের হিসাব রাখে? দারিদ্র্যের চাপে পড়ে যে-মেয়েটি ইস্কুলের মুখ দেখতে পায়নি অথচ প্রতিদিন ঘরের কোণে, মায়ের পাশে, রান্নাঘরে জীবনের সহজ পাঠ নিতে নিতে বুদ্ধিমতী ও যথার্থ শিক্ষিতা হয়ে ওঠে, তাকে কি আমরা বলতে পারি, তুমি পাশ করেছ? যে-ছেলেটি দরিদ্র কৃষাণের হাত ধরে, কখনো মাঠে কখনো খামারে কখনো বা গোশালায় জীবন-যুদ্ধে কর্মকুশল সৈনিকের মতো আটে-পিঠে শক্ত ও বিজ্ঞ হয়ে ওঠে, তাকে কি বলতে পারি, তুমি শিক্ষিত?

অথচ এই আটপৌরে শিক্ষাই জীবনকে ধরে রাখে, বাস্তব বুদ্ধিতে জোগান দেয়। কেতাবী জ্ঞানের অভাব পূর্ণ হয় শাণিত সাধারণ জ্ঞান দিয়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাই আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'শিক্ষার হেরফের' ঘুচিয়ে দাও। সেদিনের শান্তিনিকেতনে তিনি রচনা করেছিলেন মুক্ত শিক্ষার অঙ্গন। কর্মমুখী শিক্ষার দ্বার অবারিত

করেছিলেন গান্ধীজি। এঁরা সকলেই চেয়েছিলেন শিক্ষাকে বন্ধন মুক্ত করতে, বিদ্যাকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে।

একথা কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, গতানুগতিক নিয়মের বন্ধন না থাকলেও মুক্তশিক্ষা কোনো এলোমেলো ব্যাপার নয়। এর জন্য আয়োজন চাই, চাই উপযুক্ত মানসিকতা। একটু তালিম, একটু অভ্যাস সব-কিছুকে গুছিয়ে দেখতে ও বুঝতে সাহায্য করে। মনের এই গঠনের ফলে লেখাপড়ার প্রকৃতি পাল্টে যায়। ছেলেদের জন্য একধরণের খেলনা পাওয়া যায়। তার ইংরেজি নাম ক্যালাইডোস্কোপ। (Kaleidoscope) একটি লম্বা চোঙ বিশেষ। তা দিয়ে রকমারি ছবি দেখা যায় যার সবগুলি সাজানো এবং সুন্দর। চোঙটি চোখে লাগিয়ে যেভাবেই ঘোরানো যাক-না-কেন সব-সময় একটি চমৎকার গোছানো ছবি (প্যাটার্ন) দেখা যাবে। আসলে তিনটি কাঁচ বা আয়না ত্রিভুজাকৃতি হয়ে চোঙের ভেতর থাকে। আর তাদের মাঝখানে ছড়ানো থাকে কয়েক টুকরো রঙ বেরঙের কাঁচ। তাদের বার-বার প্রতিফলিত ছবি বিজ্ঞানের নিয়মে সাজানো প্যাটার্ন তৈরী করে। পড়ুয়ার মনের ফ্রেমকে ঐ যন্ত্রের মতো প্রতিফলনশীল করতে পারলে সহজ পাঠের মধ্য দিয়ে সব-কিছু সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে। জগতের প্যাটার্নটি ভালভাবে দেখা যাবে। এই হচ্ছে মুক্ত শিক্ষার সার্থক রূপ। 'ধানের উপর একটি শিশির বিন্দু'র মধ্যে আলো যে ঝলমল সৌন্দর্য আছে তাকে প্রত্যক্ষ করতে হলে মনকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, যার নাম মুক্তশিক্ষা।

সুখের কথা, মুক্তশিক্ষার এই ধারণা শুধু আর কল্পনা বিলাস নয়। একে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা চলেছে দেশে বিদেশে। ইস্কুলের চার দেওয়ালের গন্ডী ভেঙে দিয়ে সমাজের সঙ্গে তাকে একাকার করার আন্দোলন চলছে। আমাদের দেশেও তার ঢেউ লেগেছে। গ্রামে গ্রামান্তরে গতানুগতিক ইস্কুলের চাইতে মুক্তশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের উপযোগিতা এখন অনেকেই স্বীকার করছেন। কিন্তু পড়ুয়ার দল আজও যেখানে ভিড় করে আছে, সেইসব ইস্কুলেও মুক্তশিক্ষার প্রচলন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কে করবে এই কাজ? আমি বলি, বড়রা যা করে করুক, ছোটরাই এগিয়ে আসুক না কেন? পড়ুয়ারাই জমিয়ে তুলুক মুক্তশিক্ষার আসর। কেমন ভাবে তা সম্ভব, সেইটাই আলোচ্য।

সাকসেস্ পাবলিশিং হাউসের
স্মরণীয় প্রকাশন

Edited by M. Karati

SUCCESS'S POCKET DICTIONARY
(ENG. TO BENG.)
৫ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উপযোগী
২২০০০ শব্দ সম্বলিত ১০০০ পৃষ্ঠার বই
Price-Rs.10·00

SUCCESS'S CURRENT DICTIONARY
(ENG-BENG & ENG.)
৫ম শ্রেণী হইতে ১২শ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উপযোগী
২৪০০০ শব্দ সম্বলিত ১৩০০ পৃষ্ঠার বই
Price-Rs.18·00

শ্রীঅনিল বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত
পূর্ণ কলেবর (পদ্যে)

সচিত্র সপ্তকাণ্ড
কৃত্তিবাস রামায়ণ
মূল্য রাজ সং ৩৬ টাকা
মূল্য সাধারণ সং ৩০ টাকা

— প্রাপ্তিস্থান —
সাকসেস্ পাবলিশিং হাউস
১ নং বিধান সরণী কলিকাতা-৭৩

উক্ত বইগুলি ক্রয়কালীন
[পক্ষিরাজের গ্রাহকদের টাকায়
২৫ পয়সা ছাড় দেওয়া হবে।

এস, আমরা ইংরিজি শিখি

লীলা মজুমদার

কথা বড় ভয়ংকর জিনিস, যেমন আনন্দ, তেমনি দুঃখ দেয়। যেমন তেমন করে ভাষার কাজ করতে হয় না। কথার ব্যবহার দিয়েই ভাষা তৈরি হয় ; তাই দিয়ে একজনের মনের কথা দশজনকে জানানো যায়। যুগ যুগের জ্ঞান বিদ্যে কথা দিয়ে লিখে রাখা যায়, যাতে কেউ ভুলে না যায়। দূরের মানুষকে কথা দিয়ে ভালোবাসা জানানো যায়, তার কুশল জানা যায়। পণ্ডিতরা, কবিরা তাঁদের অমূল্য চিন্তাগুলো কথার মধ্যে ধরে দিয়ে যান। জন্মেই মানুষের ছেলেমেয়ে কথার খোঁজে কেঁদে বলে "ওম্মা!" মরবার সময় মানুষের ঠাকুরদারা নাতিদের দিকে চেয়ে বলে "নাম কর!" কথার কি কম কাজ নাকি। সেই কথা কিভাবে সব চেয়ে সুন্দর করে বলা যায়, তা-ও জানতে হয়। মিষ্টি কথায় জগৎ ভোলে, কটু কথায় শত্রু তৈরি হয়। দুঃখে, ব্যথায়, লজ্জায়, আনন্দে, গৌরবে আপনা থেকেই মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে আসে। সে কথা সুন্দর হলে, জীবনযাত্রাও সুন্দর হয়।

এতো গেল নিজের ভাষার কথা, যা মানুষের ছেলে-মেয়েরা শুনে শুনে শেখে, কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। কি মিষ্টি, কি সহজ এই সব নিজেদের কথা। গোল বাধে শুধু অন্য দেশের কথা শেখার বেলায়। আগে ভাষাটি শিখলে, ছোট ছোট মনের কথা সেই ভাষাতে বলতে পারলে, অন্য লোকের বলা সহজ কথার মানে বুঝলে। তার পরে বই পড়ার পাঠ নিলে। ছোট ছোট কবিতা পড়লে, মুখস্থ করলে, মুখস্থ বললে। ছোট ছোট গল্প শুনলে, পড়লে, মুখে মুখে বললে। ক্রমে বিদেশী কথাগুলোর সঙ্গে ভাব হল। কথার মধ্যে রস জমল। কথাগুলোকে তখন নিজের লোক বলে মনে হতে লাগল। তার বিদেশী ভাব ঘুচল। তখনি শুরু হয়ে গেল সেই ভাষায় মনের কথা, লেখা, বলা। তার আগে অবধি শুধু শোনা কথা, পড়া কথার কারবার করেছিলে, এবার নিজে—ভাবা কথার কারবার কর।

এমনি করে ৬৪ বছর আগে আমি ইংরিজি শিখেছিলাম। আর ভুলিনি, আর কখনো ভুল করিনি। প্রথমে ছবি দিয়ে এ-বি-সি-ডি চেনা। সে তো মোটে ২৬ টা অক্ষর, দু'দিনে চেনা হয়ে গেল। তখন ছবি-ওয়ালা বই খুলে দেখি, পাশাপাশি দুটো তিনটে চেনা অক্ষর বসালেই একটা কথা হয়ে গেল। পাশেই তার ছবি। কথাটাও চেনা হল। তারপর পর-পর কয়েকটা কথা বসিয়ে দিব্যি সুন্দর গল্প হল। সেই গল্প বারবার পড়া হল, শোনা হল। তারপর বই বন্ধ করে মেম-দিদি বললেন, "এবার লেখ দিকিনি গল্পটা।" তেড়া-বাঁকা হরপে, পাঁচটা ভুল করে তো লেখা হল। মেম-দিদি বললেন, "এবার বই খুলে ভুলগুলো সব ঠিক কর।" তাও করা হল। এই ভাবে আরো পাঁচ ছয়টা গল্প শেখা হল।

কিছুদিন বাদে মেম-দিদি বললেন, "স্কুলে আসার পথে কি কি দেখলে লেখ তো দেখি।" তারপর একদিন বললেন, "সকাল থেকে এখন অবধি কি কি করলে লেখ দিকিনি।" এমনি করে নিজের মনের কথা লিখতে শিখলাম। পরে একদিন বললেন, "বই খুলে দেখ তো কটা জিনিস, কি জানোয়ার, কি মানুষ, কি জায়গার নাম পাও ; কটা মনের ভাবের নাম পাও। এগুলোকে 'নাউন' বলে। 'নাউন' শেখা হলে কত রকম 'নাউন' হয়, গল্প পড়তে পড়তে তাও চিনতে শিখলাম। যে-সব কথা দিয়ে নড়া-চড়া কাজ-করা এইসব বোঝায় তাকে 'ভার্ব' বলে, এ-ও শিখলাম। একটা জিনিস না বেশি জিনিস ; এখনকার কথা, না আগের কথা, না পরের কথা ; কম গুণ কি বেশি গুণ, একে একে সব শিখলাম, গল্প কবিতা পড়তে পড়তে। ইংরিজিতে বলে 'PARTS OF SPEECH,' তার মানে ভাষার অংশ। মানুষের পেটের ভিতর যেমন নানা যন্ত্র থাকে, যেগুলো খারাপ হলে, মানুষের অসুখ করে, ভাষারো তেমনি নানান অংশ থাকে, যেগুলো ভুল করলে, ভাষা ভুল হয়। কিন্তু আলাদা করে সেগুলোর কাণাকড়ির মূল্য, ভাষার মধ্যে বসল, তবে তার আদর হল, কদর হল।

আমিও যখন ওপরের ক্লাসে উঠে পাঠ্য-তালিকায় লেখা দেখলাম NESFIELDS GRAMMAR, এই মোটা এক বই! ভয়ে ভয়ে বইটা খুলে দেখি, ওমা! এরা যে সব আমার চেনা বন্ধু! দুটো-একটা নতুন নাম পেয়েছে, গুণ ধরেছে, এই মাত্র। ভাষাই আমার সব, ভাষার টুকরো এরা, এরাই-বা আমার পর কিসের? আমার মায়ের সুন্দর হাত দুটি মনে পড়াই মানে মাকে মনে পড়া, এ-ও যেন তাই। একে ভয় করার কিচ্ছু নেই।

এ স্মৃতি সুখের
এ স্মৃতি আনন্দের

পি, কে, ব্যানার্জী

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, পক্ষিরাজ প্রথম সংখ্যায় ভারতের সর্বকালের একজন অন্যতম ফরওয়ার্ড ও ফুটবলের জাদুকর সামাদ্ সাহেবের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের মুহূর্তটি তুলে ধরেছিলাম! তাঁর সঙ্গে আলাপের পর থেকে যে কটিদিন আমরা ঢাকায় ছিলাম, জানিনা কেন, আমি যে রকম শ্রদ্ধাপ্লুড হয়ে পড়েছিলাম উনিও যেন তেমনি স্নেহ ও ভালবাসার পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তা নইলে যে পনের দিন ঢাকায় ছিলাম তার চৌদ্দদিনই ঠিক সন্ধ্যা বেলায় তিনি আমার ঘরে এসে উপস্থিত হবেন কেন! এবং ঘন্টার পর ঘণ্টা আমার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

আরেক দিনের ঘটনা। সেদিন বার্মার সাথে খেলা ছিল। আগের ম্যাচে প্রচণ্ড চাপের মুখে ক্ষুর ধার প্রতিযোগিতায় নাছোড় বান্দা সিলোনকে হারিয়ে আমাদের মনোবল সেদিন যথেষ্ট বর্ধিত ছিল। সে খেলায় একটু একটু দল বদলও করা হোল। আমারই মতন দু'টি নতুন মুখ দলে স্থান পেল। একজন পিটার থঙ্গরাজ। যিনি পরবর্তীকালে ভারতের সর্বকালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোল কিপার বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলেন। অপর জন নেভিল্ ডি-সুজা! তিনি এলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরওয়ার্ড সাহু মেওয়ালালের জায়গায়। সেদিন দলের এক নম্বর গোলকিপার সনৎ শেঠ নিজে সিলেক্শন্ কমিটির কাছে আর্জি পেশ্ করে তাদের রাজী করিয়ে থঙ্গরাজকে খেলালেন। আজকালকার ফুটবলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এ দৃষ্টান্ত বিরল। যা হোক নতুন এঁদুজনের দলভুক্তিতে দলের আক্রমণ অনেক ধারালো হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে গোল-কিপারের দলভুক্তিতে দলের আক্রমণ ধারা কিভাবে ক্ষুরধার হয়ে উঠতে পারে? তাই বলি সেদিন আমার প্রথম গোলটি (ভারতীয় দলেরও প্রথম গোল) হয়েছিল অনেকটাই থঙ্গরাজের সেই আশি গজ দূরত্বের কিকের কৃতিত্বে। আমার সাথে থঙ্গরাজের আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ছিল যখন ও বলটি হাতে তুলে নিয়ে মাটিতে দু'বার ড্রপ দেবে সেবার ও সবচেয়ে বড় ও জোরালো কিক্‌টি মারবে। খেলা সুরুর ৬ মিনিটের মধ্যে থঙ্গরাজ বল কোলে নিয়ে দু'বার ড্রপ্ দিলো। আমি ছিলাম মাঝ মাঠে। আমি তখন আর কোন দিকে না তাকিয়ে প্রচণ্ড বেগে বিপক্ষের গোলকিপারের দিকে দৌড়াতে লাগলুম। বিপক্ষের লেফ্‌ট ব্যাক, সেণ্টার হাফ্ ও রাইট্ ব্যাক (তখন ২ ব্যাক্ ও W. M. প্রথায় খেলা হোত) কিছু বুঝে উঠবার আগেই হতচকিত হয়ে আমার পিছু নিলো, ততক্ষণে নতুন বলটি ৬ ফিট ৩½ দীর্ঘ চেহারার ৮০ কেজি ওজনের থঙ্গরাজের স্লেজ্ হ্যামার মারা কিক্‌টি খেয়ে কাটা ঘুড়ির মত বার্মা গোলের দিকে উড়ে চলেছে। বল আমাকে পার করে চলে গেল। মনে হচ্ছে আর বোধ হয় নাগাল পাবো না। কিন্তু তাকিয়ে দেখি বার্মার গোল-কিপার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে দাঁড়িয়েই বল ধরবে না ছুটে এসে ধরবে ভেবে পাচ্ছে না। এই আমার

সুযোগ। মুহূর্তের মধ্যে আমার গতিকে চরম দ্রুততর করে গোল-কিপার বল ধরবার আগেই বলকে মিট্ করার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। স্থির করলাম প্রয়োজন বোধে ফ্লাইং ডাইভ করেও বলে হেড করবো বা পা ছোঁয়াবো। কিন্তু আগেই বলেছি বার্মার গোলকিপার স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে। আর বিপক্ষের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রাও প্রায় আমার দশ গজ দূরে ছুটে আসছে। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। যে প্রচণ্ড ঝুঁকি নেবার সংকল্প নিয়েছিলাম তা আর করতে হোল না। সেই ৮০ গজ দূর থেকে প্রায় ৫০ ফুট উঁচু দিয়ে প্রচণ্ড বেগে উড়ে এসে বলটি পেনাল্টি বক্স এর বাইরে ড্রপ করে আবার ২০ ফুট উঁচুতে লাফিয়ে উঠলো। গোল-কিপারের ততক্ষণে দিবা নিদ্রা কেটেছে। হতচকিত হয়ে আমায় বল ছোয়া থেকে বিরত করতে এগিয়ে এলো। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ৬ বছর বয়স থেকে এ্যাথলেটিকস্ স্পোর্টস করার অনুশীলনগুলো কাজে লেগে গেল! বলটি থেকে এখনও আমি প্রায় ১০ ফুট দূরে। বল হাওয়ায় ভেসে নামছে। ঐ গতিতেই আমি Long Cum High Jump এর সাহায্যে পড়ন্ত বলটির কাছে পেঁছে গেলাম। বলটি তখনও বার পোস্ট এর উচ্চতায় এবং গোল-কিপারও কোন উপায় না দেখে ডাইভ্ করেছে। কিন্তু তার হাত বলের কাছে পেঁছানোর আগেই বাতাসে দোদুল্য মান অবস্থায় হেড্ করে বল বার্মিজ জালে জড়িয়ে দিলাম। এই গোলটি নিয়ে সেদিন বহু উচ্ছ্বাস এবং প্রশংসা হয়েছিল। ঐ খেলায় আমরা ৫—২ গোলে জিতেছিলাম। নবাগত নেভিল্-ডি—সুজা দুটি, আমি দু'টি আর পূরণ বাহাদুর একটি গোল করেছিলো। সেই খেলায় আমাদের খুবই ভালো খেলার প্রয়োজন ছিল, কারণ তখন এশিয়ার এক নম্বর রাইট্ আউট বার্মিজ দলের রাইট উইংগার সুখ বাহাদুর (যার বর্মী নাম ছিল মঙ্ মঙ্) খেলেছিলেন। এবং ঐ খেলার পরে ঢাকার সব সংবাদপত্রের শ্রেষ্ঠ ফরওয়ার্ডের শিরোপাটা আমার মাথাতেই অদ্ভুত ভাবে এসে গিয়েছিল। দ্বিতীয় গোলটি করায় সময় (দলের ৫ম গোল) এতো জোরে মেরেছিলাম যে জাল ছিড়ে বল বাইরে চলে গিয়েছিল। তার আগেও প্রচণ্ড জোরে মারা দুটি শট্ বারে লেগে গিয়েছিল।

সেদিনের খেলায় গোটা স্টেডিয়ামের লক্ষ লক্ষ দর্শকের সপ্রশংস বাহবা ও ভালোবাসা পেয়েও কিন্তু সেদিন ভারতীয় ফুটবলের সেই জাদুকর সামাদ সাহেবকে খুশী করতে পারিনি! আগের দিন দাড়ি না কামানোর জন্য বকেছিলেন, আর এদিন আরও প্রচন্ড বকুনি দিলেন যে সেদিন আমার দল ৭ গোলে জিততে পারতো। দু'টি গোল আমি নিজে করেছিলাম। আর দুটি সতীর্থকে দিয়ে করিয়েছি। কিন্তু যে দু'টি শটে আমার শুটিং এর শক্তি জনসমক্ষে বাহবা কুড়োবার জন্য তুলে ধরেছিলাম সে দুটি যদি আস্তে মেরেও গোল করতে পারতাম, কিংবা কোন সতীর্থকে দিয়ে গোল করাতে পারতাম তবে তিনি খুশী হতেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "তুমকো কোন্ খেলা শিখায়া? আউর কিসকো শুটিং বাতা রহে হো? এক্ শটমে ক্যা দো গোল্ মিল্তা?" সেদিন একথা শুনে অসহায় এবং দুঃখ বোধ করলেও উপদেশটির সারমর্ম উপলব্ধি করে কোনদিন এ ঘটনাটি ভুলতে পারিনি। আর আজই-বা ভুল্লাম কই? [চলবে

খেলা নিয়ে প্রশ্নের উত্তর

পি, কে, ব্যানার্জী (পি. কে)

* দেবাশিস্ ও সুভাশিস্ দে, খড়্গপুর

—ভারত এখন বিশ্বকাপ ও অলিম্পিকে ফুটবলে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পায় না কেন?

ঃ সুযোগ আছে কিন্তু সামর্থ্য নেই বলে।

—ওয়েস্ট-ইন্ডিজের কালিচরণ (ব্যাট্স্ম্যান) কি ভারতীয়?

ঃ তাঁর পূর্বপুরুষ ভারতীয় ছিলেন রোহন কানাহাইয়ের পূর্বপুরুষদের মত।

* নিবেদিতা চক্রবর্তী, কৃষ্ণনগর

—"আনন্দ মেলায়" চুনী গোস্বামীর আত্মকথা বেরুচ্ছে। আপনারা সেরকম কোন প্রাক্তন খেলোয়াড়ের আত্মকথা ফুটবল লীগ্ চলাকালীন বের করবেন কি?

ঃ আপনার প্রস্তাবটি ভালো। তবে বাচ্চা পক্ষিরাজ যখন উড়তে শিখবে তখন অনেক হীরে জহরতেরই জীবনালেখ্য দেওয়া হবে।

* ভাস্কর ভট্টাচার্য, বরাহনগর

—ভারতে শ্রেষ্ঠ ফুটবল ক্লাব কোন্‌টি?

ঃ কোন্ দিক দিয়ে—অভিজ্ঞতায়, সংগঠনে না ট্রফি জেতায়?

* সমর, ইন্দ্রনীল, অনিমেষ, কিংশুক, চন্দননগর

—এবার কোন্ দল লীগ জয় করবে—মোহনবাগান, না ইষ্টবেঙ্গল?

ঃ তুমি যেই দলকে ভাবছো ঠিক সেই দল।

—মহামেডান ফুটবল দলের অধিনায়ক কে ?

* হাবিব খাঁ।

* বিশ্বজিৎ, হুগলী

—দূর প্রাচ্যের যে দলগুলোর সাথে মোহনবাগান খেলে এলো তাদের ক্রীড়া ধারা কি কোলকাতা ফুটবলের থেকে উন্নত ?

ঃ হ্যাঁ

—মোহনবাগান দূরপ্রাচ্যের খেলায় কি রকম সাড়া জাগাতে পেরেছে ?

ঃ মোহনবাগান এবার ১৯৫৬ সালের মত না খেলতে পারলেও খুব খারাপ খেলেনি। বিশেষ করে এবছরের থাইল্যান্ডের "কিংস পাপ' এর রাণার্স আপ্ বি-টিম্ (দ্বিতীয় দল) তাদের এ-টিমের চেয়েও সুখ্যাত এবং শক্তিশালী। দু'বছর ধরে বিখ্যাত বৃটিশ কোচ্ ট্রেভার হ্যাড্লীর কাছে নিবিড় প্রশিক্ষণরত তাদের বিপক্ষে শেষ খেলায় একটি পেনাল্টি মিস্ করেও ৩—১ গোলে জয়লাভ করে ভারতীয় ফুটবলের ভাবমূর্তিকে নিশ্চয় উজ্জ্বল করেছে।

* তাপস চক্রবর্তী, হাওড়া

—আমার শারীরিক অবস্থা ভাল নয়—অর্থাৎ রোগা। সেদিক থেকে আমাকে কি করতে হবে ?

ঃ নিয়মিত ব্যায়াম করো কি ? পড়াশুনোয় মন বসে না লিখছো। আধুনিক ফুটবলে তবে কিন্তু ভালো খেলা অসম্ভব। ভালো খেলতে হলে খেলাধুলোর বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক দিক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত কম। তারপরে চাই পরিমিত আহার, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও উপযুক্ত ব্যায়াম। এখনও শুধু খেলাধুলো করেই আমাদের দেশে সামাজিক কৌলিন্য যোগাড় হয় না ; দু'দিন আগে কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছো ভারতের সর্বকালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় মারা গেছেন (প্রদ্যোৎ ভেঙ্কটেশ্)। তিনিও লেখাপড়া বিশেষ শেখেননি। কিন্তু ক্রীড়াশৈলীতে লক্ষ লক্ষ লোককে দিনের পর দিন তিনি যে নির্মল আনন্দ দান এবং তৃপ্তি যুগিয়ে গেছেন তার প্রতিদানে অবহেলায়, অবজ্ঞায় প্রায় অনাহারে সকলের অলক্ষ্যে তাঁর মৃত্যু। সুতরাং সাবধান।

—আমার পজিশন হচ্ছে রাইট হাফ্ব্যাক। যার জন্য আমাকে ফরওয়ার্ডদের বল যোগানো, আক্রমণভাগকে ক্ষুরধার করা, বিপক্ষের ফরওয়ার্ডদের আটকানো প্রভৃতি কাজ করতে হয়। উক্ত কাজে উন্নতির জন্য আমাকে কি করতে হবে ?

ঃ আধুনিক ফুটবলে মাঝমাঠের খেলোয়াড়রা হচ্ছে সুপার প্লেয়ার। তারা যেমন বিপক্ষের আক্রমণকে ভুল পথে চালিত করতে ওস্তাদ বা সেগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে তৎপর তেমনি নিজের আক্রমণ ভাগকে বিভিন্নাবস্থায় সুন্দর সুন্দর পাশের সাহায্যে চালিত করতেও সিদ্ধহস্ত। এমনকি তাদের কাজ সময় ও সুযোগ বুঝে নিজের দলকে জেতাবার জন্য খুব অল্প সুযোগেই চকিতে গোল করে জয়লাভে সাহায্য এবং প্রয়োজনে দ্রুত গতিতে পিছিয়ে পরে রক্ষণ ব্যবস্থাকে জোরদার করা। এদের সব দিকে ঘুরে খেলতে হয় বলে এবং যে কোন দিক থেকে বিপক্ষের খেলেয়াড় আক্রমণ করতে পারে বলে বলের উপর অসম্ভব ভালো দখল দরকার—সে যে কোন উচ্চতাতেই বল আসুক না কেন। অসম্ভব দম, দ্রুতগতি ও চকিতে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও চাই। বিপক্ষের খেলাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ও তাদের দুর্বলতাকে বুঝে সেই অনুসারে নিজের আক্রমণ রচনার ক্ষমতা ও তাদের দুর্বল বুঝে সেই অনুসারে নিজের আক্রমণ রচনা ক্ষমতা, ট্যাক্লি, হেডিং ড্রিব্লিং; শুটিং এককথায় টপ্ অল-রাউন্ডার হতে হবে। সব মিলিয়ে এ্যাথেলেটিক্সে ডেকাথলন্ চ্যাম্পিয়নের সব গুণাবলী দরকার।

প্রশ্ন স্পষ্ট হওয়া চাই এবং দুটির বেশি যেন না হয়। বেশি হলে উত্তর সম্ভব নয়। জায়গা কম। খেলা নিয়ে প্রশ্ন যেন অন্য বিভাগের প্রশ্নের সঙ্গে একই কাগজে লেখা না থাকে। —পি, কে

একবার এক সভায় এক ভদ্রলোকের বক্তৃতা করার কথা। কিন্তু সময় উত্তরে গেলেও তিনি আসছেন না দেখে শ্রোতৃমণ্ডলী অবাক হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন। শোনা গেল কিছুক্ষণ আগে তাঁর একটি সন্তান মারা গেছে, তাই তাঁর দেরি। এই ভদ্রলোক হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে

অজয় বসু

পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে রাজকুমার বেরিয়েছেন দিগ্‌বিজয়ে। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী ডিঙ্গিয়ে কোথায় না গেলেন তিনি! যেতে যেতে জনপদ, রাজ্য, কতো দেশই না তিনি জয় করে ফেললেন। কেউ তাঁর পথ আগলে রাখতে পারলো না।

কী মজা, কী মজা!

রয়ে সয়ে বলা। তারিয়ে তারিয়ে শোনা। হাঁ করে চেয়ে থাকা ঠাকুরমার ঠোঁটের পানে! কী ভালই না লাগতো শুনতে। শুনে মনে মনে কতো ছবি আঁকা হয়ে যেত। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখা হোত স্বপ্ন। দিগ্‌বিজয়ী রাজকুমারকে পাওয়া যেত একেবারে হাতের কাছে। তখন তো ছবি আঁকারই দিন। স্বপ্ন দেখার কাল।

কালে ঠাকুরমা কোথায় হারিয়ে গেলেন। রয়ে গেল তাঁর ঝুলিটি। আর সেই ঝুলি থেকে বেরিয়ে এলেন আর এক ঝাঁক রাজপুত্তুর।

তাঁরাও পক্ষিরাজের সওয়ার। তাঁদেরও লক্ষ্য দিগ্‌বিজয় করা। তবে যুদ্ধ করে নয়। খেলে। বলো দিকিনি তাঁরা কারা? তাঁরা পক্ষিরাজের পিঠে চড়ে কি খেলায় দুনিয়া জয় করতে বেরিয়েছিলেন?

চট্‌ করে মনে পড়ছে না তো? তা কী করেই-বা পড়বে? তাঁরা তো আর ঠিক একালের খেলোয়াড় নন। তাঁরা হলেন ইতিহাসের পুরানো সব পাতা।

তাহলে আমিই বলি। তাঁরা হলেন ভারতীয় পোলো খেলোয়াড়। পক্ষিরাজের সওয়ার। তাঁদের দলেও অনেক রাজা মহারাজা, রাজকুমার ছিলেন। এবং সত্যি বলতে কি, তাঁরা একদিন পোলো খেলায় বিশ্ব বিজয়ও করে ফেলেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের কালে এইসব খেলোয়াড় বিদেশে গিয়ে নানান প্রতিযোগিতা জিতে অন্য মুলুকের মানুষের স্বীকৃতি আদায় করে নিতেন। কিন্তু তখনো বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসর বসে নি।

যেদিন বসলো সেদিন পোলো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্মান আঁকা হয়ে গেল ভারতেরই কপালে।

বছর কুড়ি আগেকার কথা। নর্মাণ্ডির দ্যাভিলে পাতা হয়েছিল বিশ্ব পোলো প্রতিযোগিতার আসর। আর সেই আসরে ফরাসী, মেক্সিকান ও স্প্যানিশ খেলোয়াড়দের সম্মিলিত দলকে হারিয়ে ভারত বিশ্ব বিজয় করে! দ্যাভিলের আসরে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন জয়পুরের মহারাজা অধিনায়ক, রাও রাজা হনুৎ সিং, কিষেণ সিং, বিজয় সিং ও অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে প্রেম সিং।

ওলিম্পিক হকিতে সোনা পাওয়ার মতোই দ্যভিলে কাপ দ্য ওর জয় করা মস্তো কৃতিত্বের পরিচয়। তবে আফশোষের কথা, পোলো খেলাও ভারতের মাঠ ময়দান থেকে ক্রমশঃই বিদায় নিচ্ছে। ব্যয় বহুল খেলা। তেজী আরবী ঘোড়া আমদানী করলে তবেই উঁচুদরের পোলো খেলা যায়। বিদেশ থেকে তেজী ঘোড়া আনাতে অঢেল টাকা লাগে। এতো খরচ কে যোগাবে? রাজা মহারাজারা তো আর আজ নেই। অগুন্তি খরচের ম্যাও সামলাবে কে? এখন এই খেলাটির চলন রয়েছে শুধুমাত্র ফৌজি অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে।

এককালে ভারত পোলো খেলায় বিশ্ব খ্যাতি অর্জন করেছিল। অথচ ভারতে আজ ওই খেলাটির অস্তিত্ব নেই বল্লেই হয়। তা না থাক, খেলাটি যে মজার, তাতে আর সন্দেহ কী?

মস্তো মাঠ। সাঁই সাঁই করে ঘোড়া ছুটিয়ে স্টিক দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে বলটিকে গোলের মধ্যে পাঠাতে হবে। ভাল খেলতে হলে সাহস ও বুদ্ধি থাকা চাই। আর চাই ঘোড়ায় চড়ার সব কৌশল রপ্ত থাকা। দক্ষ সওয়ার ছাড়া দক্ষ পোলো খেলোয়াড় হওয়া যায় না।

পোলো প্রাচীন খেলা। হাজার হাজার বছর আগে পারস্যে ও চীনে এই ধরণের খেলা হোত। তবে আধুনিক কালে এই খেলাটি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে যায় ভারত থেকেই। কোথা থেকে শিখেছিল জানি না, তবে মণিপুরীরা বহুদিন থেকেই পোলো খেলছে। পোলো তাদের খেলা পাল-পার্বন, উৎসব আয়োজনে তাদের পোলো খেলা চাই-ই চাই!

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে একদল মণিপুরী পাঞ্জাবে গিয়ে সেখানকার ইংরাজ সেনানীদের ঘোড়ায় চড়ার নানা কৌশল দেখাবার ফাঁকে প্রদর্শনী পোলোতেও যোগ দেয়! খেলা দেখে গোরারা তো তাজ্জব। শুধায় তারা, এ খেলার নাম কী? মণিপুরীরা বলে পুলু। মণিপুরে খেলাটির নাম তাই-ই ছিল। সেই পুলুই ইংরাজী ভাষাভাষীদের উচ্চারণে পোলোতে রূপান্তরিত হয়েছে। পুলু অর্থে মোটা বাঁশের গাঁটের ভেতরের দিকটা। ওই অংশ দিয়েই পোলো বল তৈরি হয়।

মণিপুরীদের দেখাদেখি গোরারা পোলোতে হাত পাকাতে শুরু করে। তারপর দেশে ফিরে এই অভিনব খেলাটির পত্তন ঘটিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পোলো ঘিরে

গোটা ইংলণ্ডেই যেন সাড়া জেগে ওঠে। এমনি করেই একদিন মজার খেলা পোলো ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স, স্পেন সুদূর আমেরিকা ও আর্জেন্টিনায় ছড়িয়ে পড়ে।

তবে আমাদের দেশে মণিপুরীরাই কী সর্বপ্রথম পোলো নিয়ে মেতে উঠেছিল? পথিকৃৎ কী তারাই? বোধ হয় না। কারণ ইতিহাস বলছে যে দাস রাজবংশের প্রথম সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবেক পোলোর মতো এক খেলতেন। আর যাঁরা ভাল খেলতেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাদশা আকবর পোলো খেলার নিয়ম কানুন ছক বেঁধে দেবারও চেষ্টা করে গেছেন। পাতৌদির নবাব ইফতিকার আলি খাঁও পোলো খেলতে খেলতে প্রাণ হারান। কষে ঘোড়া ছোটাবার কালে জিনের ওপর বসা নবাব আক্রান্ত হন হৃদরোগে। সে রোগ আর সারে নি।

পাতৌদির নবাব ইফতিকার আলিকে চিনতে পারলে তো?

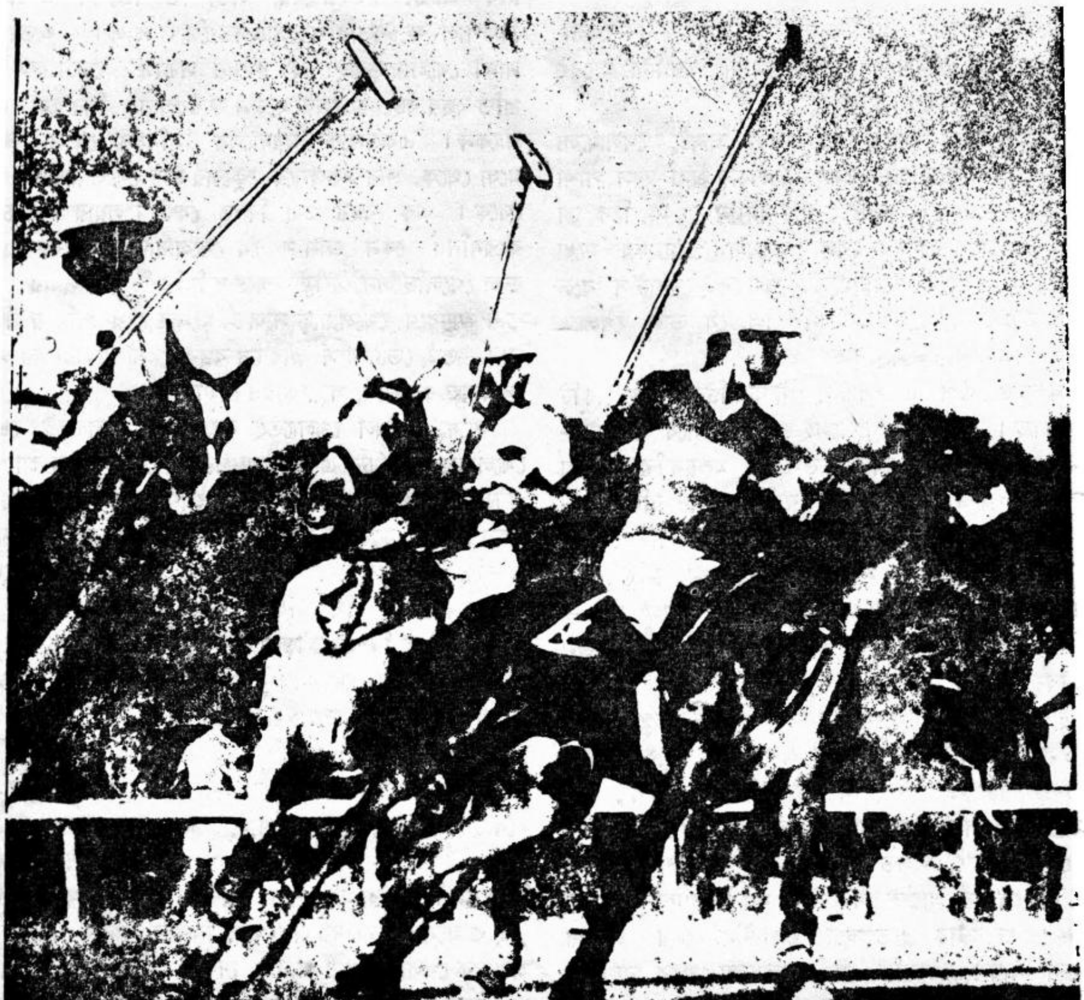

ধরণের খেলা খেলার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারান। লাহোরে তাঁর সমাধিক্ষেত্রের স্মারক স্তম্ভে তাঁর মৃত্যু কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। স্মারকটি তৈরি হয় দ্বাদশ শতকে।

শাহনশা আকবরও পোলো খেলতেন। নিজে

না চেনার কথা নয়। তিনি ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। তাছাড়া টেস্ট ক্রিকেট একদা তিনি ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেছেন। তোমাদের অতি পরিচিত একালের পাতৌদি, মনসুর আলি খাঁ হলেন ইফতিকারেরই পুত্র।

স্পোর্টস এবং স্পোর্টসম্যান

মুকুল দত্ত

ইংরাজি স্পোর্টস কথাটির মানে তোমরা জান—খেলাধুলা, আমোদ প্রমোদ। স্পোর্টসম্যান কথাটির মানেও নিশ্চয়ই জান—যে খেলাধুলা করে।

তোমরা হয়তো বলতে পার একটু আধটু খেলাধুলো সবাই করে। বুড়োরাও সময় কাটাবার জন্য তাস পাশা খেলেন। তাহলে কি সবাই স্পোর্টসম্যান? না, ঠিক তা নয়। যে কোন রকমের খেলা আমোদ প্রমোদের মধ্যে পড়লেও সাধারণত ব্যায়ামমূলক খেলাকেই স্পোর্টস বলে এবং আমরা তাকেই স্পোর্টসম্যান বলি, যে ভাল খেলতে পারে—খেলায় যার নাম যশ হয়েছে।

কিন্তু এর উপরেও স্পোর্টসম্যান কথাটির পৃথক একটি অর্থ আছে! অভিধান খুললেই দেখতে পাবে স্পোর্টসম্যানের অপর অর্থ—খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, জয় পরাজয়ে অবিচলিত ব্যক্তি! যদি বলি—He is a real sportsman বা true sportsman, তবে কী অর্থ করবে? সে সত্যিকারের একজন ক্রীড়াবিদ? এ অর্থ করলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। ঠিক অর্থ হবে—যে সত্যিকারের খেলোয়াড় সুলভ মনোবৃত্তি সম্পন্ন একজন ক্রীড়াবিদ।

তাহলে দ্যাখো, স্পোর্টসম্যান কথাটি কত বড়। স্পোর্টসম্যান কথাটির সঙ্গেই তার আচরণটি জড়িয়ে আছে। সে আচরণটি কী? না, নিয়ম নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা, জয় পরাজয়ে অবিচল এবং খেলোয়াড়সুলভ আচরণ!

এই খেলোয়াড় সুলভ আচরণের গন্ডি কিন্তু খেলার মধ্যে বা খেলার মাঠেই সীমাবদ্ধ নয়। গন্ডি অনেক ব্যাপক! জীবনের প্রতিক্ষেত্রে স্পোর্টসম্যানের আচরণ দেখানো যায়! এমনকি, যে খেলাধুলো করে না সেও স্পোর্টসম্যানের পরিচয় দিতে পারে। এক কথায় বলা যায়—ন্যায় নীতি উদারতা মহত্ব, এই সবই হচ্ছে স্পোর্টসম্যানের ধর্ম ও কর্ম!

ধর্ম আচরণ, কর্ম আচ্ছাদন। তাহলে দেখতে পাচ্ছ খেলোয়াড়সুলভ আচরণ বিসর্জন দিয়ে যে খেলাধুলো করে সে সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান নয়। স্পোর্টসম্যানের আচরণে থাকবে নিয়মনিষ্ঠা, জয় পরাজয়ে অবিচলিত মনোভাব, সর্বকাজে আচ্ছাদনের মত জড়িয়ে থাকবে উদারতা, মহত্ব, ন্যায় নীতি! তাই তো যখন বেস্ট প্লেয়ার নির্বাচন করা হয় তখন খেলোয়াড়ের ক্রীড়াদক্ষতাই শুধু বিচার করা হয় না, তার সঙ্গে বিচার করা হয় মাঠের মধ্যে আর মাঠের বাইরে তার আচরণ!

তোমরা নিশ্চয়ই জান, ভেটারেন্স ক্লাব নামে একটি ক্লাব আছে, যে ক্লাবের সভাপতি ছিলেন অতীতের দিকপাল ফুটবলার পরলোকগত গোষ্ঠ পাল। অতীতের নামী খেলোয়াড়রাই ওই ক্লাবের সভ্য। ভেটারেন্স ক্লাব প্রতি বছর বছরের সেরা দুজন ফুটবলার নির্বাচন করে থাকেন। একজনকে ময়দানের সিনিয়র খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে, আর একজনকে স্কুলের ছাত্র খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে। এক বছর ওরা কিন্তু বেস্ট প্লেয়ার নির্বাচনই করেননি। কেন জান? যে খেলোয়াড় সে বছর খুব ভাল খেলেছিলেন, ক্রীড়া দক্ষতায় যিনি ছিলেন সবার সেরা তার আচরণে খেলোয়াড় সুলভ মনোভাবের পরিচয় ছিল না। তাই ভেটারেন্স ক্লাব সে বছর বেস্ট প্লেয়ারের নাম ঘোষণাও করেননি, পুরস্কারও দেননি।

শুধু ফুটবল খেলাতেই নয়, সব খেলাতেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচন এবং পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা আছে। ক্রীড়া সাংবাদিকদের স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবও প্রতি বছর ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, কাবাডি, সাঁতার, অ্যাথলেটিকস প্রভৃতি খেলাধুলোয় শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদকে নির্বাচন করে তাদের পুরস্কার দেন। সি এ বি পুরস্কার দেন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের। সবাই কিন্তু ক্রীড়াগুণের সঙ্গে ক্রীড়াবিদের আচার আচরণও খতিয়ে দেখেন। স্পোর্টসম্যানের এই আচার আচরণকে বলা হয় স্পোর্টসম্যানশিপ।

কুস্তি, কাবাডি, ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন খেলা বাদে আমাদের দেশে প্রায় সব খেলাই তো আমদানী করেছিলেন ইংরেজরা। শুধু আমাদের দেশে কেন পৃথিবীর অনেক দেশেই ইংরেজরা নানা খেলা ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন খেলা শুধু দেহ ও মনের আনন্দের জন্য নয়, নিজের আনন্দ পাওয়া বা অপরকে খেলা দেখিয়ে আনন্দ দেবার জন্যও নয়, খেলার মধ্য দিয়ে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে, নিয়মনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে পারে। খেলা চরিত্র গঠনের একটা মাধ্যম। খেলার মাঠে শিক্ষার অঙ্গন।

এই যে ক্রিকেট খেলা। এ খেলাও ইংরেজদের সৃষ্টি। ইংরেজরা কিন্তু ক্রিকেটকে শুধু খেলা বলেই গ্রহণ করেনি। তাঁদের কাছে ক্রিকেট একটা আচরণ। তাই অন্যায় ও

অশালীন কাজকে তাঁরা ধিক্কার দেয়—"ইটস নট ক্রিকেট" বলে। "ইটস নট ক্রিকেট" কথাটির অর্থ—তুমি ন্যায়সঙ্গত কাজ বা ন্যায় আচরণ করছ না।

আমাদের সমাজের যাঁরা নেতা বা যাঁরা সরকার চালান তারাও অনেকদিন থেকে খেলাধুলোর উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। খেলা চর্চার সুযোগ দিচ্ছেন। স্পোর্টস স্কলারশিপের ব্যবস্থা হয়েছে। খেলায় ভাল হলে স্কুল কলেজে পড়ার নানা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। চাকরী পাওয়া অনেক সহজ হচ্ছে। চাকুরে খেলোয়াড়দের বেশি ছুটি মিলছে। এ সব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে কি বিদেশ থেকে একটি দুটি মেডেল এনে দেবার জন্য? মেডেল জয়ের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। তাতে দেশের সুনাম বাড়ে। দেশের আর পাঁচজন খেলায় অনুপ্রেরণা পায়।

কিন্তু খেলাধুলোর প্রসার এবং খেলাধুলোয় উৎসাহ দেওয়ার মূলে উদ্দেশ্য ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনে সাহায্য করা। তাদের প্রকৃত স্পোর্টসম্যান করে গড়ে তোলা।

ব্রিটিশ আমলে চাকরীর দরখাস্তে সবাই একটা কথা লিখত—"আই অ্যাম এ গুড স্পোর্টসম্যান"। কারণ সাহেবরা স্পোর্টস এবং স্পোর্টসম্যানকে সত্যিই ভালবাসতেন। এখন কিন্তু "আই অ্যাম এ গুড স্পোর্টসম্যান" লিখতে হলে তার প্রমাণ দিতে হয়। গুড স্পোর্টসম্যানের চাকরীরও অভাব হয় না। আবার খেলায় বেশি নাম করলে চাকরী করারও দরকার হয় না। খেলে এখন প্রচুর টাকা রোজগার করা যায়। দিন দিন সুযোগ আরও বাড়বে। কিন্তু তার আগে প্রথম গড়তে হবে নিজের স্বাস্থ্য। সেই সঙ্গে করতে হবে লেখাপড়ার সঙ্গে খেলা চর্চা প্রকৃত স্পোর্টসম্যান হবার জন্য।

ভেবে ভেবে সমাধান

দেশ-বিদেশের খেলা ও খেলোয়াড়দের বিষয় নিয়ে এটি তৈরি করেছেন

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

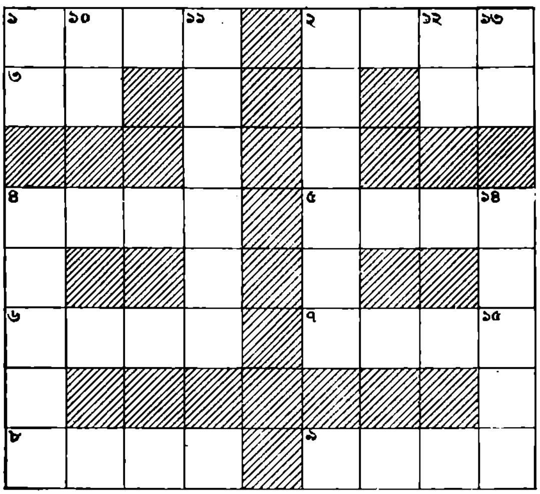

[নির্ভুল উত্তর দিলে পুরস্কার মিলবে।]

॥ সূত্র ॥

পাশাপাশি ঃ

১। প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় (৪ অক্ষর)
২। দাবা খেলোয়াড় (৪ অক্ষর)
৩। ফুটবলের একটি মার (২ অক্ষর)
৪। এর নেতৃত্বে ক্রিকেট খেলায় ভারত প্রথম অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল (৪ অক্ষর)
৫। অনেকদিন আগেকার ভারতীয় দলের খেলোয়াড় (৪ অক্ষর)
৬। ইংলণ্ডের ক্রিকেট অধিনায়ক (৪ অক্ষর)
৭। এবারের বিশ্বকাপ ফাইনালে একটি গোল দাতার নাম (৪ অক্ষর)
৮। টেনিস খেলোয়াড় (৪ অক্ষর)
৯। বিশ্বের সবচেয়ে নাম করা মুষ্টি যোদ্ধার ভাই (৪ অক্ষর)

ওপর থেকে নীচে ঃ

১। যা ছাড়া ফুটবল খেলা হতেই পারে না (২ অক্ষর)
২। দাবা খেলোয়াড়ের নাম (৫ অক্ষর)
৪। একটি খেলার নাম (৩ অক্ষর)
৬। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক (৩ অক্ষর)
১০। ফুটবল খেলার একটি মার (২ অক্ষর)
১১। সবচেয়ে বিখ্যাত মুষ্টি যোদ্ধা (৬ অক্ষর)
১২। ক্রিকেটে পিচের ওপর একটি রেখার নাম (২ অক্ষর)
১৩। সব খেলার শেষে যা পাওয়া যায় (২ অক্ষর)
১৪। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক (২ অক্ষর)
১৫। নাম করা ফুটবল খেলোয়াড় (৩ অক্ষর)

প্রতিদিনের জীবন থেকে

কবিতা সিংহ

আজ আগে পক্ষিরাজ-বন্ধুদের চিঠি দিয়ে শুরু করি। আমাদের একজন বন্ধু রুমা দাস প্রশ্ন করেছিল —স্কুলে সবাইকে বন্ধু করতে পারি না কেন? এই প্রশ্নের আরও উত্তর এসেছে।

নিউজলপাইগুড়ি থেকে শুক্লাদেব আর ক্ষমা দেব (গ্রাহক নং ৭৯৫) লিখছে,—

"স্কুলে সবার মন একরকম নয়। অর্থাৎ তাদের এক একজনের চিন্তাধারা এক একরকম। সেইজন্য আমি যে কথা বলব বা আমি যেরকম ব্যবহার করব, তা অনেকেরই হয়ত ভাল লাগবে বা লাগবেনা,—এই কারণে সবাইকে বন্ধু করতে পারা যায় না।"

চম্পাহাটির ডি, কে হাইস্কুলের ক্লাশ সিক্স্ এর চয়ন কুমার দত্ত লিখছে—"সাধারণত মতের মিল হলেই বন্ধুত্ব হয়। স্কুলের সকলের সংগে মতের মিল হওয়া সম্ভব নয় কাজেই সকলের সংগে বন্ধুত্ব হওয়াও সম্ভব নয়।"

তমালকুমার মজুমদার, ফটক দুয়ার রোড, পোঃ রামপুর হাট জেলা বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ লিখছে,—"বন্ধুত্ব নির্ভর করে মতের মিলের ওপর। মতের মিল না হলে বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আর, প্রত্যেকের সংগে প্রত্যেকের মতের মিল হবে এমন কোন কথা নেই। তাই সবার সংগে বন্ধুত্ব না হওয়াটাই স্বাভাবিক।"

দুর্গাপুরের আর, পি, বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ক্লাশ নাইনের তাপস কুমার সাহা, রুমাদাসের প্রশ্নের উত্তরে রুমাকে সরাসরি লিখছে—

"স্কুলের সবাইকেই বন্ধু করা যায়। যাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে তার সাথে কিন্তু ভাল ব্যবহার করা চাই। ধর, তুমি খুবই লাজুক। একটি মেয়ের সাথে তুমি বন্ধুত্ব পাতাতে চাও, অথচ তুমি ওকে কোথাও দেখনি বা ওর সাথে তোমার আর কখনও আলাপ হয় নি। তাই তুমি লজ্জায় ওর সাথে কথা বলতে পারছো না। এই রকম যদি লাজুক হও তাহলে সবাইকে কি করে বন্ধু করবে? আর ব্যবহার? হ্যাঁ, তুমি যাকে বন্ধু করবে তার সাথে কিন্তু ভাল ব্যবহার কোরো। তুমি একটি মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করলে। প্রথম প্রথম তোমাদের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তোমার আর ঐ বন্ধুটিকে ভাল লাগছে না এবং তুমি চাইছো ও যাতে তোমার সাথে না মিশুক। যখন দেখছো বন্ধুটি তোমাকে ছাড়ছে না তখন তুমি ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে লাগলে। ব্যস, বন্ধুটি তোমার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে ত্যাগ করবে।"

এই কটি চিঠি তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম এই জন্যেই যে বন্ধু করার ভাবনাটা তোমাদের সকলেরই মনে মনে আছে, এবং কাকে বন্ধু করতে হবে সে সম্বন্ধে তোমাদের নিজস্ব বিশ্লেষণ আর বিচার বিবেচনাও আছে। আমার কাজ শুধু এই ঐশ্বর্য যে তোমাদের আছে তা জানিয়ে দেওয়া। তোমাদের দর্পণেই দেখিয়ে দেওয়া তোমাদের ছবি। তবে একটি কথা আমি এখানে একটু জুড়ে দিতে চাই। মতের মিল না হলে কি সব সময় মনের মিল হয় না? বিজ্ঞানের একটা সূত্র আছে চুম্বকের বিপরীত মেরু দুটি পরস্পর পরস্পর-কে আকর্ষণ করে কিন্তু সমমেরু দুটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। দুজনের যদি সব বিষয়েই মতের মিল হয়ে যায় তাহলে তর্ক হবে কি করে, আলোচনা হবে কি করে? পরস্পর পরস্পরের যুক্তি খণ্ডন করতে করতে নিজের নিজের বুদ্ধি শানিয়ে নেবে কি করে? —আমি কিন্তু এমন অনেক বন্ধু জুটি জানি যাঁরা একেবারেই পরস্পর পরস্পরের বিপরীত,—কিন্তু বন্ধুত্বের বয়স কারো বা হীরক জয়ন্তী ছাড়িয়েছে—কারো বা রজত জয়ন্তী।

যাক্ এবার স্বপন মোদকের প্রশ্নে আসি। গত সংখ্যায় স্বপন মোদক (গ্রাহক সংখ্যা ২৪১) প্রশ্ন করেছিল,

"মনের সমস্ত গোপন কথা বন্ধুদের কাছে খুলে বলা উচিত কি?"

স্বপনের এই প্রশ্ন নিয়ে তোমরা সববাই খুব মাথা ঘামাচ্ছ বুঝতে পারছি। তোমাদের কাছ থেকে আশাও করছি সুন্দর সুন্দর উত্তর। যাতে থাকবে তোমাদের অভিজ্ঞতার কথা।

এবার আমার কয়েকটা গল্প শোনো।

একটি গরীব চাষী ছিল। তার বৌ-টি ছিল ভয়ংকর মুখ আলগা। সে সব কথা সববাইকে বলে ফেলত। একবার সেই চাষী ক্ষেত থেকে ফিরতে ফিরতে, ভরসন্ধ্যে বেলা পথ হারিয়ে চলে গেল এক ভূতের জঙ্গলে। সেই ভূতের জঙ্গলে ছিল এক দয়ালু ভূতের রাজা। চাষীর

দুঃখ কষ্ট অভাবের কথা শুনে সেই ভূতের রাজা চাষীকে যক্ষের ধনের ঠিকানা বলে দিল। চাষী ঠিকানা নিয়ে সেই ধন দেখে এল মস্ত এক বটগাছের খোঁদলে। কিন্তু অত ধন সে আনবে কি করে একা একা? আবার বৌ-কে নিয়ে যদি ধন আনতে যায় তাহলে বৌ-তো সব কথা সববাইকে বলে বসবে। অনেক মাথা খাটিয়ে চাষী করল কি মাছপুকুর থেকে দুটো বড় বড় মাছ তুলে ক্ষেতের মাটির ঢেলার মধ্যে রেখে দিল। তারপর মিঠাই ওয়ালার কাছ থেকে কিছু জিলাপী ভাজিয়ে বাড়ির কাছাকাছি একটা শুকনো বাবলা গাছের ডালে ডালে ঝুলিয়ে দিল। বাড়ির দরজার কাছে বসে থাকা পুষি বেড়ালটাকে মুড়ে দিল একটা হরিণের মাথা ওয়ালা চামড়া দিয়ে। তারপর বাড়িতে এসে বৌকে বলল—বৌ আমি অনেক গুপ্তধন পেয়েছি। চলো গুপ্তধন গুলো নিয়ে আসি।

বৌ-তো খুশি হয়ে গুপ্তধন আনতে চলল। বাড়ির দরজার কাছে বেড়ালটা মিউ মিউ করে ডাকছিল। বৌ হাতের লণ্ঠনটা তার গায়ে ফেলেই চমকে উঠে বলল,— ওমা ওটা কি গো?

চাষী বলল,—কেন তুমি বেড়াল ডাকা হরিণ দেখনি এর আগে?

বৌ আলোটা হরিণের কাছে নিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখে বলল,— ও — মা, তাইতো গো। ওটাতো বেড়াল না, — হরিণই তো বটে!

চাষী তাড়া দিতে বৌ আর সে সব কথা না ভেবেই চলল তার পিছন পিছন। বাবলাগাছের কাছে আসতেই চাষী বলল,—আলোটা ধরোতো একবার। বাবলা গাছে মনে হচ্ছে যেন কিসের ফুল ধরেছে।

বৌ লণ্ঠন তুলে ধরেই অবাক্ — ও — মা, একি গো, এ যে জিলিপি ফলে রয়েছে গাছ ভর্তি —

তাড়াতাড়ি বৌ দুচারখানা জিলিপি খেয়ে নিল, আর দুচারখানা ভরল পেটকাপড়ে।

আরো এগিয়ে পড়ল চাষীর ক্ষেত।

চাষী বলল—এসো, ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। ইচ্ছে করেই চলল মাছ পুঁতে রাখা জায়গাটির কাছ দিয়ে। বলল,—বৌ, লণ্ঠনটা ধরোতো! মাটিতে যেন কি উঁচু হয়ে আছে! দু-দুটো বড় বড় রুই মাছ দেখে বৌ এর তো চক্ষু চড়কগাছ। মাছদুটি পেট কাপড়ে নিয়ে বৌ চলল। তারপর গুপ্তধনের বটগাছ। চাষী বৌকে বটগাছ পর্যন্ত নিয়ে গেল না। দূরে দাঁড় করিয়ে রাখল। বলল পুকুর থেকে ধনরত্ন তুলে আনছি, তুমি এই মাঠের মধ্যে দাঁড়াও।

বৌ মনের আনন্দে জিলিপি খেতে খেতে কখন বাড়ি গিয়ে মাছ ভেজে খাবে ভাবতে লাগল। চাষী ধনরত্ন এনে এনে জড়ো .করতে লাগল। তারপর দুজনে ঘরে ফিরে এসে সে-সব গুছিয়ে রাখল। রাতে মাছ ভাত খাওয়ার পর বৌ ঘুমিয়ে পড়লে চাষী ধনরত্ন পুঁতে এল অন্য জায়গায়।

পরদিন থেকে তো আর গাঁয়ে কানপাতার উপায় নেই। হৈ হৈ পড়ে গেল। চাষীবৌ ঘরে ঘরে গিয়ে বলে এসেছে তার স্বামীর গুপ্তধন পাওয়ার খবর। সবাই এলো গুপ্তধন দেখতে। মাতব্বর ব্যক্তিরা আবার রাজার কাছে নালিশ করারও হুমকি দেখাল।

চাষী সব কথা শুনে হাসল একচোট। তারপর বলল, আচ্ছা আপনারা আসুন আমার ঘরে এসে দেখে যান কোথায় গুপ্তধন আছে—তবে আপনারা কি আমার গুপ্তধন পাওয়ার আগাগোড়া গল্পটা শুনেছেন? বৌ এর দিকে ফিরে বলল,—একবার পুরো গল্পটা শুনিয়ে দাও এঁদের।

বৌ এখন ভাঙা রেকর্ডের মত গল্প আরম্ভ করল,— আমরা যখন বেরোলাম তখন দরজায় দেখলাম ছোট্ট একটা বেড়াল ডাকা হরিণ। হরিণ কিন্তু মিউ মিউ করে ডাকছিল। খানিক দূর গিয়ে বাবলা গাছ থেকে জিলিপি পাড়লাম অনেক। তারপর আমাদের ক্ষেত থেকে দুটো মাছ তুললাম, —তারপর উত্তরের মাঠের বড় পুকুর থেকে গুপ্তধন তোলা হল।

সবলোক শুনে হেসে অস্থির। উত্তরের মাঠে বড় পুকুর কই? শুধু তো একটা বটগাছ। আর ধানক্ষেতে মাছ, বাবলাগাছে জিলিপি, বেড়াল ডাকা হরিণ—। নিজেদের মাথার পাশে জিলিপির চক্র আঁকতে আঁকতে সবাই বলে গেল—বৌ-কে কবরেজ দেখাও—চাষী তখন নিজের বুদ্ধির দৌড়খানি নিজেই চুপচাপ উপভোগ করতে লাগল।

এই ছোট্ট গ্রাম্য লোককথাটির মধ্যেই রয়ে গেছে একটি সর্বকালের সর্বজনের শিক্ষার কথা। কেবল বন্ধু কেন আত্মীয় কুটুম্ব, প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যেও অনেকে থাকেন যাঁরা মানুষ হিসেবে খুব সহজ সরল, খোলামেলা। যাঁরা কোন কথা কোথায় বললে কি হয় তা অত ভেবে বলেন না সব সময়ে। কোন কথা কোথায় পৌঁছে গেলে কি ফল হতে পারে সে সম্বন্ধেও তাঁদের ধারণা নেই কোনো—সেই ধরণের মানুষদের কি মনের সব কথা অকপটে বলা উচিত?

আবার ধরো কারো সম্বন্ধে কোনো বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করে ফেললে, কিংবা রাগের মাথায় কিছু ভালোমন্দ বলেই ফেললে হয়ত বন্ধুর কাছে। পরে তার সংগে ভালো করে মিশে দেখলে তোমার ধারণা ভুল ছিল। এবং তোমার রাগ পড়ে যাবার পর তুমি নিজেই খুব লজ্জা বোধ

করলে। এই সব ক্ষেত্রে তোমার বন্ধুটি হয়তো তোমার ওই সব কথা বা মনোভাব অন্যত্র চালু করে দিয়েছে, —তখন তোমার কি অবস্থা হতে পারে ভাবো? এই ভাবো শব্দটি দিয়েই আমার কথা শেষ। আমি চাই এই শব্দটি ধরেই তোমাদের ভাবনা এগিয়ে যাক।

পুনশ্চ ঃ শেষ করতে করতে আবার শুরু করতে হ'ল একটি চিঠি হাতে আসায়। চিঠিটা সোজাসুজি আমার ঠিকানায় এসেছে। চিঠিটা তোমাদের কাছে তুলে না ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

ওপরে ছাপা অক্ষরে লেখা

"সঙ্কেতে অনুভূতির সেতু" দূরভাষ—চুঁচুড়া ৩১৩

(বাংলা পত্রিকা)

১২ শহররক্ষীমহল্লা, সাকিন চুঁচুড়া (জেলা—হুগলী)

সম্পাদক ঃ অসিত রায়

(তলায় হাতে লেখা)

মাননীয়া

কবিতা সিংহ, কলকাতা,

সম্প্রতি আপনি 'পক্ষিরাজ'-এ ছোটদের জন্য লিখেছেন। তাতে কিছু ভুল আমার নজরে পড়ল। যদিও অনেক পত্রিকাতেই এই রকম বহু অদভুত (বানানটা লক্ষণীয়) ভুল দেখি, কিন্তু ওটা ছোটদের কাগজ তাই জানাচ্ছি।

আপনি লিখেছেন, একটি মেয়ে একটি পুতুল চুরি করে এবং তার কারণ ক্লেপ্ট-ম্যারিয়া। কিন্তু ওই অসুখটি ক্লেপ্ট ম্যারিয়া নয়—ক্রীপ্ট-ম্যানিয়া (crypto many) crypto অর্থ hidden or secret, গ্রীকশব্দ Kriptos থেকে এটি এসেছে।

সুকান্ত নামে যে ছেলেটি বড় বড় কথা বলত,—সেটিও একটি মানসিক রোগ নাম Megalomania এর উল্লেখ করেন নাই।

একটি অনুরোধ, ছোটদের পত্রিকায় ভুল তথ্য পরিবেশন করবেন না।

নমস্কারান্তে
অসিত রায়
১৭।৭।৭৮

এখন পক্ষিরাজের বন্ধুদের বলি,—একটু Dictionary দেখেশুনে, বড়দের জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করে তোমরাই বলো Kleptomania কথাটা ঠিক কিনা, না Cryptomania কথাটা ঠিক? এমাসের জন্য এই কাজটি তোমাদের দিলাম।

শিশু ও কিশোরদের পড়ার ও পড়ানোর মত বই

পক্ষিরাজ

সম্পাদনা ঃ **প্রেমেন্দ্র মিত্র** সহযোগী ঃ **মনোজ দত্ত**

বাংলা ভাষায় এযাবত প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গল্প, উপন্যাস, নাটক, ভ্রমণ কাহিনী, শিকার কাহিনী, বিজ্ঞান, খেলাধুলা, ইত্যাদি বহু সার্থক রচনায় সমৃদ্ধ অদ্বিতীয় চয়নিকা।

।। গল্প ও উপকথা ।।

বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর, মাধুরীলতা (রবীন্দ্রনাথের কন্যা), শরৎচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, বনফুল, বন্দে আলী মিঞা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

।। উপন্যাস ।। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদার

।। নাটক ।। ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

ছড়া ও ছবি

অন্নদাশংকর রায়, অমিতাভ চৌধুরী, সত্যজিৎ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী

।। কবিতা ।।

রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, মনোজ নন্দী, প্রসিত রায় চৌধুরী, জসীমউদ্দীন, নজরুল, জীবনানন্দ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুখলতা রাও, অজিত দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আরও অনেকে।

। বিজ্ঞান, খেলাধুলা, ম্যাজিক, অন্যান্য ।।

জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, পি. সি. সরকার, শংকরী প্রসাদ বসু, মনোজ দত্ত প্রমুখ।

নতুন গল্প ঃ সন্তোষ কুমার ঘোষ

দাম ঃ দশ টাকা

পক্ষিরাজের গ্রাহকদের জন্য আট টাকা মূল্য নির্ধারিত হল।

প্রধান পরিবেশক ঃ **সাকসেস পাবলিশিং হাউস**
১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭৩

সকাল বেলা

সন্তোষ কুমার ঘোষ

খুব কষ্ট। এই বুড়ো বয়সে সেই ব্যাপারটা যেমন শ্বাস টান্‌তে টান্‌তে জানি, মধ্য বয়সেও রক্তের ছল্‌ছলাতে তেমনই টের পেতাম। আজ শ্বাস টানতে লাগে (তোমাদের এসব বলব কেন বলতো!) যখন বয়স ধুপধাপ আসে, তখন কী হয়? যেন জোয়ার। সব ভাসায়, সব দিককে বিদিক ক'রে দেয়। কোটালের বান বলে একটা কথা আছে না? সেটা শুধু মোহানা থেকে অথৈ ঢেউ আর লোনা জল নিয়ে আসে। মাঝ বয়সের যে বান সেটা বললামই তো, শুধু রগের আর রক্তের। শুধু চোখের ইশারার বিজলীর। আমাদের কালে লোডশেডিং হত না।

সব কষ্ট, সব বিদ্যুতের চমক কিংবা তোমরা কেউ পোড়ো-বাড়ি দেখেছ? —জানালাগুলোর পাল্লা নেই, কাচটাচ সব ঝন্‌ঝন্‌ ঠকাস্‌ ঠকাস্‌। হু-হু আর হা-হা হাওয়া বয়ে যায়। বুকের ভিতর দিয়ে। এটা শুধু বেশী বয়স আর মাঝ বয়সেরই ব্যাপার নয়, এসবের শুরু কম বয়সেই। ভোরবেলাতেও ঝড় বৃষ্টি ঝেঁপে আসে। কাঁপায়, এমন কি কাঁদায়। অন্তত আমাকে তো কাঁদাত।

ধরো, যেবার অংকে আমি একশ'র মধ্যে নব্বুই পেলাম। সেবার আমার থুরথুরে বুড়ো দাদু, তাঁর দাড়ি প্রায় রবীন্দ্রনাথের মতন, অবিশ্যি গায়ের রঙ্‌ তেমন বিলিতি বেগুন মানে টোমাটো নয়, একেবারে দেশী এলোকেশী বেগুন (আজকাল অবিশ্যি সেই এলোকেশী বেগুনও দেখতে পাইনে), মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকলেন।

মাথা নীচু করতেই হত। কারণ আমাদের ঘরের দরজাটা খুব নীচু ছিল। দাওয়া মাটির, চালের খানিকটা খড়, খানিকটা টিন, উঠোনে পেঁয়াজ কলির পাশাপাশি বর্ষায় উৎফুল্ল বেলফুল—দূর! কাকে বল্‌ছি, কাদের জন্যে লিখছি? তোমরা এসব দ্যাখোইনি, তোমরা এসব জানোই না।

দাদু মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকলেন, আমার স্মরণে এইটুকু বেঁচে বা মরে আছে। তিনি বকলেন না, গন্‌গনে উনুনের চোখে চাইলেন না, শুধু ভিজে চোখে আমাকে দেখলেন। ক্রুশের প্রথম কাঁটাটা যীশুকে কী ভাবে বিঁধেছিল জানি না, ওই চাউনির মুখোমুখি হয়ে, ভিতরে বাইরে একেবারে কেঁপে গিয়ে টের পেলাম, ভিজে চোখও পোড়াতে পারে।

তাঁর কাশফুলের মত সাদা দাড়ি শুধু কাঁপছিল। হয়তো কাঁপছিল তাঁর চোখের পাতাও। আর যে হাতে তিনি মার্কসীটটা বাড়িয়ে দিলেন সেই হাত। আমি নিজেই তো কেঁপে কেঁপে কাগজটা হাতে নিলাম! তাই তাঁর কাঁপাটা সেদিন ভালো করে বুঝতে পারিনি।

অন্যান্য বিষয়ে যাই পেয়ে থাকি, দেখলাম অংকে নব্বুই। দাদুকে বললাম "নব্বুই তো পেয়েছি।" তিনি এতক্ষণে একটু হাসলেন। বললেন "আর দশ নম্বর কোথায় গেল?

সেই দশ নম্বর কেন, তারপরে কত দশ, দশহাজার এমন কি দশলক্ষ হয়ে উড়ে গেছে, আজও কোথায় গেল, কোথায় গেল এই জিজ্ঞাসাটার জবাব মিলল না; আজও জানি না, সেদিন দাদু এসে যে মার্কসীট তুলে দিয়েছিলেন, সেটা সারা জন্মের শেষ লেখা কিনা। মানে পুরো একশ'র বদলে বরাবর আমাকে বড়ো জোর নব্বুই পেয়েই খুশী থাকতে হবে কিনা।

আজও জানি না, দাদুর সেদিনের দাড়ি-গোঁফের আড়ালের হাসিটা আসলে কি কান্না ছিল? জানি না কিছু জানি না। কেবল এইটুকু বুঝি, বাইরের হাসিটা কখনও কখনও ভিতরের কান্নাও হয়ে যায়। সেই চাউনি এখনও অনেকদূরের তারার জ্বলজ্বলে চোখ হয়ে হয় হাসে, নয় তাড়া করে, আমার অনেক অন্যায় আর ভুলকে ধমকায়।

দশটা নম্বর কোথায় গেল ? উত্তর দেব না তো। বরং বলব সব নম্বর তো যায়নি ! কিছু যায়, অনেক থাকে। এই নিয়েই বাঁচা, এই নিয়েই থাকা। তোমরাও একদিন বুঝতে পারবে। বুঝবে যে, কাঁপার একটা মানে কান্নাও হতে পারে। আর জানবে, কষ্ট পেতেই হয়। দুঃখ না পেলে সুখও মেলে না।

আমার বয়স গেছে, তোমাদের হয়নি, কিন্তু কষ্টের কখনও বয়স যায় না, বাড়েও না।

দাদু সেদিন চুপচাপ চলে গেলেন। সেই মাথা নীচু করে। তাঁর যাওয়ার পর আমি আমার মাথাটাকে বুকের ওপরে হেলিয়ে দিলাম। কতক্ষণ, কতক্ষণ জানি না, আমার কনুইয়ে চোখ রেখে বোবা কাঁদলাম ! কাঁদতেই থাকলাম, কতক্ষণ, কতক্ষণ জানি না।

তারপর মা এসে এক সময় খেতে ডাকলেন। তখন উঠোনের বেলফুলগুলো দারুণ গন্ধ ছড়াচ্ছে। অনেক দূরে 'একটা খোকা হোক' পাখি ডাকতে শুরু করেছে। আমি উঠলাম।

আমরা যেমন মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ি, তেমনই, আমাদের আবার উঠতেও হয়।

এবার শুধু দাদুর কথাই বলি। আমার শৈশব বাল্য আর কৈশোরের অনেকখানি তিনি ছেয়ে ছিলেন। যেভাবে শ্রাবণের মেঘ মাটিকে ছায়ায় ঢেকে রাখে। সেইভাবেই বেড়ে উঠেছি। কত, কত বছর। আমার দাদু ঈশ্বরে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করতেন না। নিজে নিজের মত ছিলেন। অন্তত আমি তাঁকে যতদিন থেকে দেখেছি, এতদিন পরেও যে চেহারাটা মনে মনে আঁকতে পারছি, সেটা একটি সৌম্য দীপ্ত বার্ধক্যের। দিদিমাকে দেখিনি। তিনি আগেই মারা যান। দাদুর ছায়ায় আমি বাড়তে থাকলাম। যেভাবে ঢাকা ঘরের ঘেরাটোপে পানের পাতা বাড়ে।

তিনিই আমাকে রবীন্দ্রনাথ শেখান, তিনিই পাশের বাড়ি থেকে হেড মাস্টারমশায়কে ডেকে আমাকে কীর্তন শোনান। দিদি গানগুলো তাড়াতাড়ি গলায় তুলে নিত। আমার তো গলা নেই, আমি তুলে নিতাম কানে।

যদিও হেডমাস্টার, যদিও জবর দস্ত ডাকসাইটে (হেডমাস্টার বললেই হাতে বেত একটা মহামহিম মূর্তি চোখে আভাসে ভাসে।) তবু আমাদের সেই প্রতিবেশী হেডমাস্টারমশায়ের গলাটা সুরেলা ছিল। "যদি তোর হৃদ্‌ যমুনা উছলে উছল রে ভোলা..." ইত্যাদি অনেক গান তাঁর মুখেই প্রথম শুনি। এরই সঙ্গে গানের রাগ আর ইস্কুলে যখন, তখনও কড়কড়া চোখ আর ছিপছিপে রাগ, এটা হেডমাস্টারমশায়ের মধ্যে আমি প্রথম দেখি। জানি যে মানুষ একটা নয় দুটো। টের পাই একই মানুষ এক সঙ্গে অনেক রূপ ধরতে পারে।

এই হারমোনিয়াম টেনে, রীড টিপে টিপে ভ্যাঁপো আর ভেঁপু, এই ইস্কুলে গিয়ে বেত্রহস্ত, জবরদস্ত।

হেডমাস্টারমশায়ের কথা পারলে বলবো পরে, আগে দাদুর কথাটা তো বলে নিই। ভুলতে ভুলতে সব যে মুছে যাচ্ছে। স্মৃতিটা শেলেট কিনা ! কিংবা আকাশ। কোনো লেখা কোনো দাগই ধরে রাখে না।

আজকালকার ভাষায় দাদু ছিলেন র‍্যাশনাল। বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু যাচাই করতেন। তাই বলেছি ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস আর অবিশ্বাস দুটোই ছিল সমান সমান।

আজ এইটুকু বলি, আমাকে তিনি "আমি" করেছিলেন। "ঠাকুর তুমিই তো সব চাল কলা ছোলা মটর যব।" এর কতটা ঠাট্টা কতটা বিশ্বাস, আজ তার বয়স পেয়েছি তো। তবু বুঝতে পারিনি।

যৌবনে কলকাতার ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যাতায়াত ছিল, সেটা তাঁর মুখেই শুনেছি। একটু ঢলে পড়েছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু নিজেকে সবটা ঢেলে দেননি। তাঁর দেখানো রাস্তায়, অথবা দু নৌকোয় পা দেওয়ায় যাকে বলে সেটা ওই আচরণ থেকে শিখেছি। তোমাদের আর ভারাক্রান্ত করতে চাইনে, শুধু বলি, এ কূল ও কূলে দুই কূল বাঁচানোর কায়দাটা সেই অল্প বয়সেই শিখি।

দাদুর আর একটা কথা আমার মনে গেঁথে আছে। কবে যেন সহপাঠী কাকে একটা বিচ্ছিরি গালাগাল দিই। সেই ছেলেটি ছিল সমাজের নিচুতলার লোক। দাদু অভব্য কথাটা আড়াল থেকে বুঝি শুনতে পান।

একদিন পরে আমাকে ডেকে আনেন। বলেন, ওরকম খারাপ গালাগাল তুই দিলি কেন ?

আমি চুপ করে থাকি। দাদু বলেন, ওই ছেলেটাও খুব খারাপ একটা কথা বলেছিল, তাই না ?

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, তা হয় না।

বলতে বলতে দাদু একটা কালো কাপড় আর একটা সাদা ধুতি আমার সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, এই কালো কাপড়টায় যদি আরেকটু কালির ছিটে লাগাই। তাহলে দেখা যাবে না। কিন্তু এই সাদা ধুতিটায় এক ফোঁটা কালো রঙ পড়লেও সেটা খুব কুচকুচে কালো হয়ে যাবে।

তাঁর কথাটা সেদিন বুঝেছিলাম কী নাই বুঝিনি আজও জানি না। এখনও কত কথায় কত কাজে কালির ছিটে লাগে। তবু এতদিন বাদে হঠাৎ ডুবুরি হয়ে দাদুর কথাটা তুলে আনতে পেরে নিজেকে খুব হাল্কা লাগছে। কাজে

কথায় মানি আর নাই মানি, মনে আনতে পারাটাও দারুণ দরকার।

তোমরা যখন বড় আর বুড়ো হবে তখন ব্যাপারটা বুঝবে।

খুব অল্প কদিনের অসুখেই দাদু মারা যান। আমি ইউনিভারসিটির সেরা ছাত্র হতে পারলাম কি পারলাম না, সেটা না বলাই, না শোনাই রয়ে গেল। তাঁর ইচ্ছে আর আমার সাধ্য মেলেনি, মিলল না। বরং তাঁর অসুখের সময় দাদুর তোষকের তলা থেকে রোজ দুচার আনা সরাতাম। এইভাবে আমার পুঁজি যখন তখনকার সাড়ে চার টাকার মতন, তখন দাদু হঠাৎ একটা দুপুর একেবারে খালি হয়ে গেলেন।

শ্মশানে যাই, মুখে আগুন দিই। সেই পাড়াগাঁর পুকুর পাড়ের সন্ধ্যাটা ডুবে গিয়েছিল, বেশ তো। আবার কেন ভেসে উঠল? দূরের শেয়ালের ডাক আর কাছের গাছ-গুলোর ভুতুড়ে ছায়া আবার যেন নেমে এল। শুনতে পাচ্ছি ঝিঁঝিঁর ডাক। আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল যে।

এত কাছের মানুষকে এত নিথর হয়ে দূরে চলে যেতে আমি আগে কখনও দেখিনি। ফটোগ্রাফার এলেন। নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে! আমার গায়ে আলোয়ান, খোলা মাঠে অন্ধকারে ঠান্ডা প্রেত-হাওয়া। একটা মরা চাঁদের ছোঁয়া পেয়ে মরা পুকুরটাও যেন থিরিথিরি যে আবার বেঁচে উঠেছে। আর তখনই তের বছরের একটা ছেলে জেনেছে মরা চাঁদ, মজা পুকুর, চারপাশের থমথমে পরিবেশ, যাই বা বেঁচে উঠুক, আমার দাদু আর বাঁচবেন না। মৃত্যুকে সেই সাক্ষাৎ অনুভব করলাম। কাছাকাছি, মুখোমুখি। মরণের গাঢ় নিশ্বাস যেন আমার ঘাড়ে পড়তে থাকল।

কলসি কলসি জল ঢালাও শেষ, তখন আমার এক বন্ধু হঠাৎ গান জুড়ে দিল "ফিরে চল আপন ঘরে।"

পরে শুনেছি রাগটা মালকোষ। কিন্তু সে যখন গলা খুলে বিস্তারিত হয়ে বলছিলো "মরণ নাহি মরণ নাহি" তখন ওই শীতের সন্ধ্যায় শিউরে উঠে ভাবলাম, মিথ্যে সব মিথ্যে। জীবন যেরকম আছে, মরণও আছে সেইরকমই। এর পরে "ফিরে চল" কথাটায় একটা অবোধ বালক সান্ত্বনা পায় কী করে?

আকাশে হয়তো কালপুরুষ থেকে সপ্তর্ষি সবই ছিল। কিন্তু সব দাপিয়ে ছিল অন্ধকার। আলোয়ানটা গায়ে জড়াতে জড়াতে সেদিনের ছেলে-মানুষ খোকাটা—মানে এই আমি—ভাবছিলো, ফেরার ডাক দিলেই সবাই ফেরে না।

অন্তত যাঁর চিতাভস্ম এক্ষুনি ধুয়ে মুছে গেছে সেই দাদু আর ফিরবেন না। অনেকক্ষণ ধরে সেই চুপচাপ অথচ কথা-বলা পরিবেশে গানটা—তালগাছের পাতায় পাতায়, তারা থেকে তারায় ছড়িয়ে যাচ্ছিলো।

সুর থাকে তবু মানুষ বরাবরের মত যায়, সেই দিন জেনেছি। ফটো যিনি তুলেছিলেন তাঁর নাম লালবিহারী চক্রবর্তী। অনেকদিন একটি মৃত দাদুর পাশে নিষ্পাপ আহত একটি বালকের মুখ-আঁকা ছবিটা আমার কাছে ছিল। তারপর সেটাও কবে—কবে যে, হারিয়ে ফেলেছি! আজ না আছে দাদু, না ওই ছবিটা।

খালি ওই স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। তাকে ধরে রেখেছে।

"ফিরে চল" এই গানটা ফিরতে বলছিল, কাকে? আমাকে? আজ এতখানি বয়সের ভাঁটিতে লগি ঠেলে ঠেলে ঠেকে গিয়ে টের পাচ্ছি, গানটা মিথ্যে। ফেরা যায় না! লোকে শুধুই চলে। কেউ সটান, কেউ কুঁজো হয়ে, কেউবা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তবু পিছনে যাওয়া অসম্ভব।

যেতে হয়। আর যেভাবেই হোক, সেটা সামনের দিকে। পিছনটা শুধু হাতছানির মতো পড়ে থাকে। [চলবে

মধ্যে আছে আরো অনেক কিছু। নতুন বিজ্ঞানের উন্মেষ, আত্মদর্শন এবং আরো ভালোভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা ইত্যাদি অনেক কিছুই ইন্দ্রজালের আওতায় পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ ব্যাপারটাও ত ইন্দ্রজাল।

আমাদের সভ্যতার জন্মের সাথে সাথেই ম্যাজিকের জন্ম।

যেখানেই মানুষের বাস ছিল সুসভ্য বা অসভ্য, সেখানেই ছিল ম্যাজিক। তবে আজকের ম্যাজিক আর সেদিনের ম্যাজিক মোটেই এক নয়।

কথিত আছে ভগবান নাকি নিজের চেহারার অনুকরণে মানুষ তৈরী করেছিলেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব থেকে বড় জাদুকর সৃষ্টিকর্তা নিজে। আর পৃথিবীর মধ্যে প্রথম জাদুকর হলেন তিনি, যিনি প্রথম সৃষ্টি রহস্যের কিছু কিছু কৌশল, এক কথায় বিজ্ঞান প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন।

কমলকুমার খাঁ, বজবজ

—জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ম্যাজিক প্রসঙ্গে আপনার বাবার লেখা যে বই দুটির কথা উল্লেখ করেছিলেন তাদের প্রাপ্তিস্থান জানাবেন।

ঃ তুমি যে কোন বইয়ের দোকানে অর্ডার দিলে পাবে। অথবা নীচের ঠিকানায় টাকা পাঠালেই তোমাকে ডাক যোগে বই পাঠিয়ে দেবে। ঠিকানাঃ ইন্দ্রজাল পাবলি-কেশনস। ২৭৬/১, রাসবিহারী এভেনু কলিকাতা ১৯

ম্যাজিক নিয়ে প্রশ্নের উত্তর

জবাব দিচ্ছেন—**জাদুকর পি সি. সরকার (জুনিয়র)**

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অনেক নামই বলতে হয়। সেটা সম্ভব নয়। তবু বিশেষ কয়েকটি নাম উল্লেখ করলাম। যেমন,

টেন কাট্ সু (মহিলা জাদুকর, জাপান), কিও (রাশিয়া), রবেয়া উদাঁ (ফ্রান্স), ম্যাসকেলাইন (ইংল্যান্ড), হ্যারী হুডনী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), চিং লিং য়ু (চীন), চ্যাং (দক্ষিণ আমেরিকা) ওকিটো ব্যামবার্গ (হল্যান্ড)

লীনা মিত্র, কলিকাতা ২০

—ম্যাজিকে পারদর্শী হবার জন্য আপনি কি ম্যাজিক ছাড়া অন্য কোন বিষয় গভীর ভাবে পড়াশুনো করেছেন? কয়েকটা খুব সহজ, খুব মজার ও সহজ লভ্য জিনিসের ম্যাজিক শিখিয়ে দেবেন কি?

ঃ হ্যাঁ, তবে সেটাকে ম্যাজিকের আওতার বাইরে বললে ভুল হবে। ম্যাজিকের মধ্যে ব্যক্তিগত গুণ ছাড়া আরো তিনটে বিষয় আছে। (১) বিজ্ঞান, (২) মনোবিজ্ঞান (৩) কলা। কৌশলটাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন বা দর্শকদের মন জয় করতে গেলে উপরোক্ত তিনটে বিষয়েই দখল থাকা চাই, এই কারণেই আমাকে বিভিন্ন ম্যাজিকের কৌশল ছাড়াও **Physics, Chemistry, Psychology,** Literature, Sociology, Geometry, Acting ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছে।

অপর্ণা মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা

—ম্যাজিক ও ইন্দ্রজালের মধ্যে তফাৎ কি? ম্যাজিকের জন্ম কতদিন আগে? কোন্ দেশে ম্যাজিকের জন্ম হয়? পৃথিবীর প্রথম যাদুকর কে?

ঃ ম্যাজিক কথাটা এসেছে 'Magi' থেকে। বাইবেলে এই 'Magi' কথাটা 'পণ্ডিত ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে ম্যাজিককে বলে Wizardy. অথবা Wizard কথাটা এসেছে 'Wise mans' art' থেকে। সুতরাং বুঝতেই পারা যাচ্ছে—ম্যাজিক অথবা Wizardy যাই বলি-না-কেন পাশ্চাত্যের লোকেরা তাকে জ্ঞানী গুণী লোকেদের কাজকর্ম বলেই ভাবতেন। তখনকার দিনে যাঁরা একটু প্রগতিশীল ছিলেন বা প্রকৃতির বিভিন্ন নিয়ম কানুনের অনেকগুলোকে —এককথায় বিজ্ঞান ব্যাপারটাকে, অন্যের তুলনায় কিছুটা বেশী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরাই ছিলেন এই সমস্ত জ্ঞানী গুণী লোক 'বা Magi' অথবা Wizard বলে পরিচিত। তাঁরা যখন বিজ্ঞানটাকে কাজে লাগাতেন তখন অন্যান্য সহজ সরল লোকেরা সেগুলোকে ম্যাজিকের কেরামতি বলেই ভাবতেন। সেজন্য প্রাকৃতিক অনেক রহস্য বুঝতে না পেরে সাধারণ মানুষ কুসংস্কারাবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং অলৌকিক অনেক কিছুরই কল্পনা করে 'ম্যাজিক' বিষয়ের কথা ভাবতে শুরু করেন। ব্যাপারটা আদৌ সত্যি, না মিথ্যে সে-সম্পর্কে কোন উপসংহার না টেনেই কল্পনার রাজ্যে তাকে স্থান দিয়ে ম্যাজিককে সমাজে স্থান দেয়। আজকের দিনের ম্যাজিসিয়ান এবং সে-যুগের ম্যাজিসিয়ানের মধ্যে এখন আকাশ-পাতাল তফাৎ। আজকের দিনের ম্যাজিসিয়ানরা কখনো দাবী করেন না যে তাদের কোন অলৌকিক শক্তি আছে।

ইন্দ্রজাল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভারতীয়। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রাজসভায় সবার মনে একটা অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করবার জন্য এক নতুন শিল্পের সৃষ্টি করেন। এসব শিল্পের নাম ইন্দ্রজাল বিদ্যা। দুঃখ কষ্ট, জরাময় এই পৃথিবীতে মানুষকে ভবিষ্যতের সুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই নাকি এই বিদ্যা। সমস্ত জগৎই নাকি এই অলৌকিক ঘোরে আবদ্ধ। আর সেজন্যই আমাদের ধর্মে আছে, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।'

পাশ্চাত্যের ম্যাজিকের থেকে ভারতীয় ইন্দ্রজাল বিদ্যা দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে অনেক উঁচু মানের।

পাশ্চাত্যের ম্যাজিকের মতো ভারতের ইন্দ্রজালও অলৌকিক কাজকর্মের বাস্তব রূপায়ণ ঠিকই। তবে এর

(অবশিষ্ট ৫৭ পাতায় দেখ)

জানার মত নানা কথা

অরুপরতন ভট্টাচার্য

সব ব্যাঙের ছাতা কি খাওয়া চলে ?

রন্ধনশালা থেকে বেরিয়ে আসার পরে ব্যাঙের ছাতার তেমন কোনো ব্যঞ্জন যে খাদ্য হিসেবে অত্যন্ত সুস্বাদু, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু সব ব্যাঙের ছাতাই কি খাদ্য হিসেবে আমরা গ্রহণ করতে পারি ?

খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্যে যে নির্দিষ্ট ফাংগাস থেকে ব্যাঙের ছাতা পুষ্ট করে তোলা হয়, তাদের কথা এখানে আসছে না। কিন্তু বন্য অনেক ব্যাঙের ছাতা দেখা যায়, এখন বর্ষার সময়ে গজাচ্ছে এখানে ওখানে, সেই সব ব্যাঙের ছাতা অতি উৎসাহীরা সংগ্রহ করে, রান্নার এক উপাদেয় উপকরণ হিসেবে।

এই সব ব্যাঙের ছাতার মধ্যে কয়েকটি আছে, যেগুলি বিষাক্ত, খাদ্য হিসেবে যা গ্রহণ করলে, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে।

তাহলে কি করব ? এই আশঙ্কার জন্যে কি সব ব্যাঙের ছাতাকে বর্জন করব ? না, তা কখনও নয়। কয়েকটি ব্যাঙের ছাতা বিষাক্ত বলে সব ধরণের ব্যাঙের ছাতা বর্জনের কোনো কারণ নেই।

কোনো ব্যাঙের ছাতা বিষাক্ত তা বুঝব কি করে ? পরীক্ষার অবশ্য একটা উপায় আছে। সে কোনো দুরূহ প্রক্রিয়া নয়। এই জন্যে প্রয়োজন শুধু একটি রুপোর টাকার। আজকালকার মুদ্রায় কতটা রুপো আছে কে বলবে, কিন্তু যদি একটি রুপোর টাকা জোগাড় করে ওই ব্যাঙের ছাতার উপরে কিছুক্ষণ চেপে ধরা যায় তাহলে ঠিক বলে দেওয়া যাবে ওই ছাতা খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য, কি নয় ?

ফল কি হবে ?

রুপোর টাকার যে দিকটি ব্যাঙের ছাতার উপরে চেপে ধরা হয়েছে, যদি দেখা যায়, সে দিকটি কালো হয়ে গিয়েছে তাহলে ওই ব্যাঙের ছাতা বাতিল, খাদ্য হিসেবে তা অনুপযুক্ত। আর যদি টাকাটি আগের মতনই থাকে, তাহলে রান্নায় সে ব্যাঙের ছাতা নিতে পারি আমরা।

কিন্তু অভোজ্য ব্যাঙের ছাতার বেলায় কালো হওয়ার কারণ কি ?

এই সব ব্যাঙের ছাতায় সালফার থাকে। মুদ্রার রুপোর সঙ্গে তার একটা ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলে। ফল সিলভার সালফাইড। এই সিলভার সালফাইড কালো

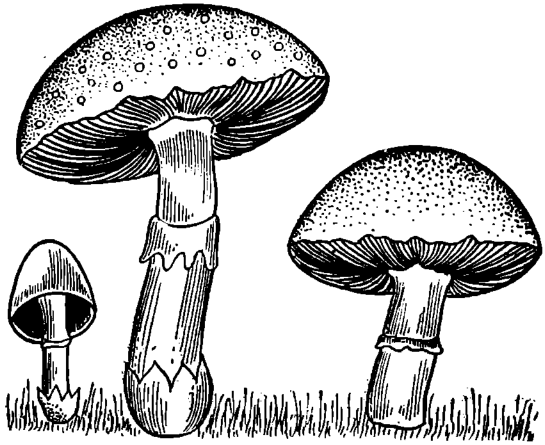

বলে মুদ্রার যে দিকটি ব্যাঙের ছাতার উপরে বসানো হয় সময়ের ব্যবধানে কালো হয়ে যায় সেই ভাগটি।

বন্য ব্যাঙের ছাতার মধ্যে কোনটি ভোজ্য দেখবার সময়ে এই কালো রংটিই কিন্তু সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করবে।

***
*

যে খবরের কাগজ বিক্রেতা তোমাদের বাড়ি রোজ সকালে খবরের কাগজ পৌঁছে দেয় তাকে তোমাদের 'পক্ষিরাজ' পেতে আজই অর্ডার দিয়ে দাও। নইলে……

*
***

বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর

সমরজিৎ কর

জ্যৈষ্ঠ ১৯৭৮ এর পক্ষিরাজে প্রকাশিত 'ধাক্কা' গল্পটি পড়ে নানা রকম প্রশ্ন তুলে অনেকেই তোমরা চিঠি লিখেছ। তবে দু-একটি ছাড়া সব ক'টি চিঠিতেই দেখছি প্রায় একই প্রশ্ন ঃ ঘর্ষ-বিদ্যুৎ কী এবং কে আবিষ্কার করেন? যারা প্রশ্ন করেছ তাদের নাম ঃ

অশোককুমার সোমমণ্ডল, বর্ধমান; শিবাজী, চুঁচড়া; লীনা মিত্র, কলকাতা; অসীমকুমার মল্লিক, খারুপেটিয়া, আসাম; দীপঙ্কর দে, রঙ্গিবাসন, মেদিনীপুর; সুপ্রভাত, বলাই চণ্ডীতলা, হুগলী; জাহাঙ্গীর কবীর, পাইজোড়া, মুর্শিদাবাদ; ভারতী, মিতালী, নান্টু, মনিকা, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা; সমীরকুমার মিত্র, দমদম, কলকাতা।

এবার ঘর্ষ-বিদ্যুৎ বা স্থির বিদ্যুতের আবিষ্কারের কথাটা বলি। যীশু খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ছয় শ' বছর আগের কথা। ওই সময় গ্রীসে একজন দার্শনিক বাস করতেন। তাঁর নাম থ্যালেস। গণিতেও তাঁর জ্ঞান ছিল খুব।

থ্যালেস ছিলেন ভীষণ কৌতূহলী। যেন পৃথিবীতে যাই ঘটুক তাঁকে জানতেই হবে—ব্যাপারটা কতকটা এই রকম। তাঁর পড়ার টেবিল সবসময়ই নানা রকম সামগ্রীতে ভরে থাকত। পথ চলছেন। পেলেন পায়ের কাছে এক টুকরো কাঠ। অমনি সেটি তুলে নিয়ে এসে রেখে দিলেন টেবিলের ওপর। কোন দিন হয়ত পেলেন একটি পাথর অথবা তামার টুকরো—ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি চলে এল তাঁর টেবিলে।

না। শুধু রেখে দেয়া নয়। মাঝে মাঝে ওই টেবিলের সামনে গম্ভীর হয়ে বসতেন তিনি। আর ভাবতেন, কী অদ্ভুতই না এই প্রকৃতি। কত রকম জিনিসই না তার ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। আর মনে মনে প্রশ্ন করতেন ঃ কেন পাওয়া যায় এসব?

এইভাবে ভাবতে ভাবতে একদিন হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, তাঁর সামনেই টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে এক টুকরো অ্যাম্বার। অ্যাম্বার এক ধরণের পাথর (ফসিল রেজিন)। অনেকে এ দিয়ে গয়নাগাটি করেন।

নজরে পড়তেই অ্যাম্বারটিকে তুলে নিলেন তিনি। তার সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করল। ভাবলেন, একটু চকচকে করে নিলে আরও সুন্দর দেখাবে। তাই নিজের গায়ের পশমের কাপড় দিয়েই সেটিকে ঘষতে লাগলেন তিনি। ধীরে ধীরে অ্যাম্বারটির রূপ যেন ফেটে পড়ল। আনন্দে মাথা দুলিয়ে অ্যাম্বারের টুকরোটি এবার তিনি টেবিলের এক কোণে রেখে দিলেন।

কিন্তু এ আবার কী কাণ্ড? থ্যালেসের দু-চোখ এবার যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। যা দেখলেন, তাও কি তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে? টেবিলের ওপর ছিল এক টুকরো কাঠ। অ্যাম্বারের কাছেই। কাঠের টুকরোটি ছুটে এল অ্যাম্বারের ওপর এবং তার গায়ে সেঁটে রইল। না, কেউ ছুঁড়ে দেয়নি এমনিতেই ছুটে এসেছে।

অ্যাম্বারটি তুলে নিয়ে নিজের পরণের পশমের কাপড়ে আবার ঘষলেন। তারপর কাঠের টুকরোটি রাখলেন তার সামনে। আবার! আবার সেই ছুটে এসে সেঁটে যাওয়া।

ব্যাপার কি? এবার দেখতে হয়, কাঠ ছাড়া আর কিছু অ্যাম্বারের কাছে ছুটে আসে কী না। দিলেন কাপড়ের টুকরো, পাখির পালক, কর্ক এবং আরও নানা রকম হাল্কা জিনিস। অ্যাম্বারটি ঘষেন আর ওই বস্তুগুলি তার সামনে রাখেন। একই ঘটনা। তারা সবাই অ্যাম্বারের দিকে ছুটে এল। এ নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামালেন থ্যালেস। কিন্তু আসল রহস্যটি তিনি বুঝতে পারলেন না।

এই ঘটনার পর কতদিন কেটে গেল। কয়েক শতাব্দী। শেষ পর্যন্ত ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে এ সম্পর্কে আসল ব্যাপার জানালেন ইংলণ্ডের এক ডাক্তার। নাম স্যার উইলিয়াম গিলবার্ট। তিনি আবিষ্কার করলেন, শুধু অ্যাম্বারই নয়, আরও নানান জিনিস ঘষলে তারও ছোট ছোট বস্তু কণা আকর্ষণ করে। যেমন কাচ, গন্ধক, গালা, প্রভৃতি। এরা বিদ্যুতের ব্যাপারে অপরিবাহী। গিলবার্টই একটি নতুন শব্দ তৈরি করলেন। গ্রীক ভাষায় 'অ্যাম্বারের' প্রতিশব্দ 'ইলেকট্রন'। তা থেকে এই রহস্যজনক আকর্ষণের নাম রাখলেন তিনি 'ইলেকট্রিসিটি।'

পরীক্ষাটি তোমরাও করে দেখতে পার। একটা কাচের দণ্ড নাও, অথবা প্লাস্টিকের চিরুনি। এবার শুকনো পশমের গায়ে ওই কাচ বা চিরুনি ঘষতে থাক। ঘষার পর টুকরো টুকরো কাগজের সামনে ধর। দেখবে, কাগজের টুকরোগুলি ছুটে এসে কাচের দণ্ড বা চিরুনির গায়ে সেঁটে যাচ্ছে। এর কারণ, ঘর্ষনের ফলে তাদের গায়ে বিদ্যুৎ কণা সৃষ্টি হয়। আমরা তাদের তখন বলি তড়িৎ আহিত বস্তু। বা চার্জড বডি। তাদের ওই বৈদ্যুতিক চার্জ বা আধানই কাগজের টুকরোগুলিকে আকর্ষণ করেছে।

অনেক সময় মাথায় তোমরা শ্যামপু কর বা সাবান দাও।

কিছুক্ষণ পর চুলটি বেশ শুকিয়ে গেলে আঁচড়াও। তখন একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ কী? যতই আঁচড়াচ্ছ, চুল আর বাগে আসছে না। বরং চটাচট তারা ছিটকে আরও ছড়িয়ে পড়ছে। কোথাও তাড়াতাড়ি যাচ্ছ হয়ত। তখন এমনটি ঘটলে কে আর বিরক্ত হয় না, বল? এখানেও সেই স্থির বিদ্যুতের খেলা! পশমের মত চুলের ঘষায় প্লাস্টিকের চিরুনিতে বিদ্যুৎ তৈরি হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল থ্যালেসের সেই ঘটনা। চিরুণি তোমার মাথার চুল আঁকড়ে ধরছে। আঁকড়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে চিরুনি থেকে কিছুটা বিদ্যুৎ কণা গিয়ে আবার হাজির হয় চুলে। যেমন জলের স্পর্শে এলে সেই জল কোন বস্তুর গায়ে লেগে যায়। এখন চিরুনিতে যে বিদ্যুৎ সেই বিদ্যুতের কিছুটা চুলে গেল, অমনি কিছুটা চুল আবার চিরুনি থেকে ছিটকে দূরে সরে গেল। কারণটা হল, একই ধরণের বিদ্যুৎ কাছাকাছি এলে তারা পরস্পর বিকর্ষণ করে, তাই। ফলে চিরুনি দেয়ার সময় চুল ছিটকে সরে যায় পরস্পর।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেছ: **তড়িৎ বিভব কী?**

উত্তরটা অন্যভাবে দিই। কেমন?

ধর একটি পিচকারিতে কিছুটা জল নিলে। এবার যেই পিচকারিটির হাতল টিপলে, তখন কী হবে? পিচকারির অন্যমুখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাবে তো? তার মানে পিচকারির এক দিকে চাপ দিলে, অপর দিক থেকে অমনি জল বেরোতে লাগল, কারণ ও দিকটায় চাপ কম। চাপ কম বলেই জলকে আটকানো গেল না। বিদ্যুতের চলাফেরার ব্যাপারটাও ওই রকম। জল যেমন বস্তু কণা, বিদ্যুৎও এক ধরণের কণা। যাকে বলা হয় ইলেকট্রন। কোন পরিবাহীর মধ্যে যখন ইলেকট্রন বইতে থাকে, আমরা বলি তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এমন প্রবাহিত এমনিতে হয় না। এখানেও থাকে ওই চাপ। যে দিকে চাপ বেশি, পরিবাহীর সে-দিকটা থেকে বিদ্যুৎ কম চাপের দিকে এগিয়ে যায়। ওজন মাপার জন্যে তোমরা যে বাটখারা ব্যবহার কর—তাকে বলা হয় গ্রাম, কিলোগ্রাম, তাই না। পথের দূরত্ব মাপতে গেলে তোমরা কাজে লাগাও মিটার, কিলোমিটার এ সব মাপ। বিদ্যুতের ওই চাপ মাপার জন্যে অমন কিছু দরকার। তার নাম 'ভোলট'। বাংলায় একে আমরা বলি তড়িৎ বিভব মাপার একক। বিদ্যুৎ সব সময় উচ্চতর তড়িৎ বিভব থেকে নিম্নতর তড়িৎ বিভবের দিকে অগ্রসর হয়।

কেউ কেউ ভালুকের ছিটকে পড়ার কথা তুলেছে। ভাই, স্রেফ গল্পের খাতিরেই বিদ্যুৎ নিয়ে ওসব কথা বলেছি। গল্পে গরু যেমন গাছে চড়ে, চুনাপাথরের টানেলেও তেমনি বিদ্যুতের ধাক্কায় বিশ্বাস মশাইএর কাঁধে চেপে ছিল। পাহাড়ে ওই ভাবে বিদ্যুৎ জমতে পারে কখনও?

আষাঢ় মাসে প্রকাশিত ভেবে ভেবে সমাধান-এ নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছে তিনজন

১ খো	২ রা	৩ না			৪ আ	৫ লে	য়া
	দা	সা	৬ অ	৭ মা		সা	
৮ অ	র		৯ ভা	১০ কু	পা	র	
য়	ফো		স্ক				১১ ডা
লা	র্ড	১২ ব	রা	হ	মি	১৩ হি	র
র			১৪ চা	ন্দ্র		ন্দু	উ
		১৫ আ	র্য	ভ	ট		ই
১৬ রো	বো	ট		১৭ ডা	ল	ট	ন

প্রদীপ মজুমদার,

'মানসী, মার্কনী মার্কেট, দুর্গাপুর ৫, বর্ধমান।

সুস্মিতা দাস, ১/৫/১ বি প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলকাতা ১২

তমালী অধিকারী, মহিষাদল, মেদিনীপুর

তোমাদের সকলের জন্য জানাচ্ছি, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে যে ভারতীয় বিজ্ঞানী সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবীর আবর্তনে কথা বলেন, তিনি আর্যভট্ট নন **আর্যভট**। আমরা অনেকেই এ ভুল করে থাকি। তোমরা তিনজনও করেছো।

আগের ঘোষণা অনুযায়ী ৫০ টাকার পরিবর্তে ৬০ টাকা মূল্যের বিজ্ঞান-বিষয়ক বই পুরস্কার দেওয়া হবে। তাই তোমরা প্রত্যেকে ২০ টাকার মত বিজ্ঞান-বিষয়ক একটি বই-এর নাম পাঠাবে। অথবা তোমরা বললে আমরা পছন্দ করে কিনতে পারি।

ধাঁধা

১ ইংরেজী ভাষার রাজ্যে
কোন্ শব্দ পেলে,
সত্যিকারের রমণীকে
বল্‌বে তুমি ছেলে ?

২ "মাটি থেকে গড়া হয়, পুনঃ হয় মাটি,
আবার গড়িতে তারে দিনরাত খাটি।
একই মশলায় তারে ভাঙে আর গড়ে,
পুরোনোটা বারে বারে নূতনেতে চড়ে।"

৩ একটি সাধারণ জীব, অসাধারণ তার অত্যাচার। কাঠ কাটে, বস্ত্র কাটে, ফসল কেটে কেটে খায়। কিন্তু ইংরেজদের টিটকিরিতে তাদের দেশে এই জীব পাখী হয়ে গান গায়। বলতো কোন্ সে এমন জীব ?

শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তর :

(১) বেল-কুল, (২) নোনা, (৩) মাছ ধরার জাল।

শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধার যাদের একটি উত্তর ঠিক হয়েছে

হুগলী—তন্দ্রা, সন্ধ্যা, সন্দীপ ও সুজিত পাল ; শমীপর্ণা ও শংখনিলয় রায়।

হাওড়া—বুলা ও টুলা হাজরা দাশনগর।

কলিকাতা—সৌমেন ও অপরাজিতা।

ত্রিপুরা—অশোক ও নমিতা বসু।

আসাম—অঞ্জু, মঞ্জু, গোপা, শ্যামল, অরুণ, বরুণ, কবিতা।

আন্দামান—এম, মান্না, এস, দত্ত।

দিল্লী—শিবাজী, স্বপন, তপন।

জামসেদপুর—বাবু, নিরঞ্জন, নিতাই, কার্তিক, তাপু, শ্যামলী, পার্থ, সুভাষ, মৃণাল দত্ত।

শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধার দুটি উত্তর যাদের ঠিক হয়েছে

কলিকাতা—গৌরী, তাপস চক্রবর্তী ; ভাস্বতী মিত্র (১১)।

২৪ পরগণা—চিত্রা, শিপ্রা, দেবাশীষ সরকার ; অলোক, কাজল, বুবুন মান্না ; স্বপন, তপু, ঋতু, রুনা, বাবুনা, অদিতি, শান্তনু, মুন্না, সোনান !

হুগলী—মোহন, প্রবীর সিংহ, ঘন্টেশ্বর, তারকনাথ, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রকান্ত নন্দী, অজয় ; নুপুর, সন্দীপ মুখার্জী।

হাওড়া—সোমা ঘোষ (৭২৫), সৌমিত্র দত্ত (১০৯৯)।

শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত ধাঁধার তিনটির উত্তর যাদের ঠিক হয়েছে

হাওড়া—প্রসূন জালুই ; পঞ্চানন গুছাইত (৬৯৪) ; অমিতা চট্টোপাধ্যায় ; শান্তনু, সুকান্ত, অমিত, কাকলি ও শ্রাবণী।

কলিকাতা—বরুণ, রুপালী রক্ষিত ; শান্তা, নন্দিতা, মনোজিৎ মিত্র ; রিংকু, অর্ণব, আরতি চক্রবর্তী ; শম্পা, শর্মিষ্ঠা ; পূর্ণেন্দু, শিবাণী, পিংকি, জলি, পরিমল, কার্তিক, মাণিক চক্রবর্তী, হীরক, আনন্দ, কাকলী, ভবানী, সুধাংশু, দোলা, কমলা, আনন্দ, নরুল, কাদের মিতালী, সুব্রত।

ত্রিপুরা—বেবী, স্বপ্না, মমতা, ঝুমা, গীতা চৌধুরী, নমিতা, কৃষ্ণ, বিল্টু, দীপিকা, পার্বতী।

হুগলী-গোবিন্দ, শক্তিপদ, নিমাই ; অচিন্ত্য, প্রশান্ত, জয়ন্ত (৩৭৪)।

২৪ পরগণা—নৃপেন্দ্রনাথ, বিদ্যুৎ, বিশ্বজিৎ, মন্টু, সুশান্ত ; চন্দন, রঞ্জন, অঞ্জন, মণিকানাথ, মাণিক, কার্ত্তিক, শাশ্বত, স্বাগত ব্রহ্ম ; গৌতম, নরেন্দ্রনাথ, শ্রীলেখা ; সন্দীপ কর ; মন্টু, নৃপেন, বিশ্বজিৎ, বিদ্যুৎ ও জিতেন ভৌমিক।

মেদিনীপুর—মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ; প্রাণাশিষ, অমলেশ, রজনী মৌ, নিবেদিতা, অরুণ, বরুণ, তরুণ, শান্তনু।

বর্ধমান—দিলীপ, রামলোচন ; শোভন, গৌতম, উত্তম (২৮২) ; অশোক সৌমণ্ডল।

বাঁকুড়া—মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়া—বুতুন, টুম্পা, রিম্পা, রতন, তপন, রুবী, চুনী।

ফুচকি দাসগুপ্ত (শিলিগুড়ি) ; অসীম মল্লিক (আসাম) গৌতম, শান্তনু, বুলি ও লাল্টু দত্ত (পুরুলিয়া)

ফাইন প্রিন্টিং হাউস, ৩৮বি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ থেকে শ্রীঅনিলকুমার করাতি কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।